ISSN 1813-0372

বর্ষ : ৮ সংখ্যা : ৩২
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১২

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ৮ সংখ্যা : ৩২

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : **অক্টোবর- ডিসেম্বর : ২০১২**

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
web: www.ilrcbd.org

বিপণন বিভাগ : ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : আন-নূর

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স
দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 100 US $ 5

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করে জান্নাতে অবস্থান করার সুযোগ দিলেন। বেশ আরামেই তাঁদের দিন কাটছিল। কিন্তু তাঁরা তাঁদের চিরশত্রু শয়তানের প্ররোচনায় ভুল করলেন, যার পরিণতিতে জান্নাত থেকে তাঁদের পৃথিবীতে পদার্পণ করতে হলো। আদম-হাওয়ার সন্তানদের সাথে শয়তানের শত্রুতা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে- একথা আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে জানিয়ে দিলেন। তাঁরা শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তখন তাঁদেরকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, পৃথিবীতে মানুষকে শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে রক্ষার জন্য যুগে যুগে পথ প্রদর্শক পাঠানো হবে। আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। তিনি অসংখ্য নবী-রসূল পাঠালেন। সর্বশেষ নবী ও রসূল হলেন মুহাম্মদ স.। আমরা তাঁর উম্মাত। তাঁরই প্রদর্শিত পথে আমাদের চলতে হবে, তাঁরই নির্দেশনা মানতে হবে।

তিনি দুনিয়া থেকে বিদায়ের পূর্বে আমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে গেছেন : কুরআন ও সুন্নাহ। এ পৃথিবীতে চলার পথে আমাদের বিভিন্ন প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হবে। সেসবের মোকাবিলায় কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সমাধান খুঁজতে হবে। যদি আমরা কুরআন ও সুন্নাহকে আমাদের জীবনের সকল সমস্যা ও সংকটে দিশারী রূপে গ্রহণ করতে পারি, তবেই আমরা সঠিক পথে চলতে পারবো।

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিচ্যুতির কারণে মুসলিম উম্মাহর অনেকে আজ সঠিক ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে, ইসলামকে ভুল ভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করছে। যেমন ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মানুষ হত্যা করা। যারা একাজ করছে তারা ভুলে গেছে, যার মাধ্যমে ইসলামী জীবন বিধান এ পৃথিবীতে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, কি ভাবে তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে হবে অথচ তিনি

তাও দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর দেখানো পথ ও পদ্ধতি ছাড়া অন্যভাবে তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হবে বিপথগামিতা। তেমনিভাবে আধুনিক কালের পর্ণোগ্রাফি। অনেক মুসলিম জেনে না জেনে এই জঘন্য কাজের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। এভাবে দুর্নীতির কথা বলা যায়, ইসলামে নারীর অধিকার বিষয়ে অজ্ঞতার কথা বলা যায়, ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শিতার অভাবে ইসলামের শত্রুদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে এসব বিষয়ে তারা কথা বলে। এসব বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানকেই সচেতন হতে হবে।

'ইসলামী আইন ও বিচার' জার্নালটির বর্তমান সংখ্যায় এ ধরনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর লিখিত সাতটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। যেমন : 'তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশনের ভূমিকা', 'সম্পদে নারীর অধিকার : বাংলাদেশের সংবিধান ও ইসলামী আইনের আলোকে একটি পর্যালোচনা', 'দুর্নীতি দমন : ইসলামী আইনের ভূমিকা', 'বাংলাদেশের পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ও ইসলামী নৈতিকতা', 'সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা' 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' এবং নোয়াহ ফেল্ডম্যান রচিত : "The Fall and Rise of the Islamic State" গ্রন্থের পর্যালোচনা।

গবেষণাধর্মী প্রবন্ধগুলো প্রচুর তথ্যভিত্তিক ও বিশ্লেষণমূলক। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাঠক প্রবন্ধগুলো পাঠ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক জ্ঞান ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করতে সক্ষম হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

-ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮ সংখ্যা-৩২
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১২

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশনের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা

ড. নাহিদ ফেরদৌসী*

[**সারসংক্ষেপ :** *তথ্য অধিকার একটি রাষ্ট্রের সুশাসনের মূলভিত্তি। জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ অনুযায়ী তথ্য জানার অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার আইন রয়েছে। এ আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মানুষ সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নানা ধরনের তথ্য উদঘাটন করে নিজেদের এবং দেশের অনেক উন্নয়ন করছে। বাংলাদেশের সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকের চিন্তা, বিবেক, বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯ ও তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা- ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি নির্মূলের জন্য এনজিসমূহ হতেও জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। পরবর্তীতে তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা- ২০১০, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা- ২০১০ এবং তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিস্পত্তি) প্রবিধানমালা- ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশনের ভূমিকা এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোকপাত করা হয়েছে।]*

তথ্য অধিকার আইন ও বাস্তবতা

তথ্য অধিকার আইনের বিশেষত্ব

তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯ এর প্রধান বিশেষত্ব হল-

(ক) বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনে একটি স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'তথ্য কমিশন' গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশে এরূপ আইন থাকলেও কমিশন গঠনের বিধান রাখা হয়নি।

(খ) তথ্য অধিকার আইনে তথ্য কমিশনকে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এ আইনের অধীনে তথ্য কমিশন কোনো ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির করার জন্য সমন জারি এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ-দলিল বা অন্য কোনো কিছু হাজির করতে বাধ্য করতে পারবে। দোষী প্রমাণিত হলে তথ্য কমিশন কোনো কর্মকর্তাকে জরিমানা করতে পারবে, তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করতে পারবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের আদেশও দিতে পারবে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

(গ) এ আইনে তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কর্মকর্তাকে জরিমানা করার বিধান রাখা হয়েছে, যা অধিকাংশ দেশের তথ্য অধিকার আইনে অনুপস্থিত।

(ঘ) এ আইনে ইন্দ্রিয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পৃথক একটি উপ-ধারা সংযোজিত হয়েছে, যা সচরাচর অন্যান্য আইনে দেখা যায় না। আইনের ৯ (১০) উপ-ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ইন্দ্রিয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য লাভে কোনো ধরনের সহায়তা প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

তথ্য অধিকার আইনের সুফল ও উন্নয়ন

তথ্য জনগণকে সমৃদ্ধ করে আর জনগণ তথ্য প্রাপ্ত হয়ে সরকারকে সহযোগিতা করতে পারে। ফলে একদিকে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, অপরদিকে তথ্যহীনতা সমাজে দুর্নীতির জন্ম দেয়। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই উন্নয়নের প্রধান বাধা দুর্নীতি। অথচ তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং সহজলভ্যতা দুর্নীতি রোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।[১] তথ্য আইনে তথ্য প্রদানে বাধ্য কর্তৃপক্ষ হিসেবে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত তথ্য জনগণের কাছে প্রকাশ ও প্রদান করতে বাধ্য।

আমাদের দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগণ তাদের অঞ্চলের জন্য ভিজিএফ কার্ড বরাদ্দ, স্বাস্থ্য-সেবা, কৃষি-সেবা, প্রতিবন্ধী শিক্ষা সেবা বা পুনর্বাসন সংক্রান্ত কোনো ব্যবস্থা যেমনঃ বয়স্ক-ভাতা, বিধবা-ভাতা সুবিধাভোগী, দুঃস্থ নারী ও শিশুর পুনর্বাসন কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী শিক্ষা ও কর্মসংস্থান, রাস্তা-ঘাট-ব্রীজ তৈরি বা মেরামত ইত্যাদি সম্পর্কে জানে না। তথ্য অধিকার আইন জনগণকে এ অধিকার দিয়েছে যে, এসকল প্রতিষ্ঠান জনসেবামূলক কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন করছে কিনা তা যাচাই করার।[২] এ আইন প্রয়োগ করে জনগণ জাতীয় বাজেটের বিভিন্ন সেবামূলক খাত সম্পর্কেও জানতে পারবে। এসব সেবা সম্পর্কে যখন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যথাসময়ে সঠিক তথ্য জানতে পারবে, তখন তারা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এভাবে আমাদের শিক্ষা, সমাজ সেবামূলক পরিকল্পনা এবং জেলা ও উপজেলায় স্বাস্থ্য-

---

১. মুহম্মদ লুৎফুল হক, *তথ্য অধিকার আইন-২০০৯*, সেমিনার প্রবন্ধ আরকাইভস এবং নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্মশালা" ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আই বি এস) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ আরকাইভস এণ্ড রেকর্ডস ম্যানজমেন্ট সোসাইটি, ঢাকা এবং হেরিটেজ : বাংলাদেশের ইতিহাসের আরকাইভস, রাজশাহী কর্তৃক আয়োজিত, ১৫-১৮ নভেম্বর- ২০০৯, পৃ. ২০

২. সানজিদা সোবহান, *তথ্য অধিকারঃ আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবতা*, দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ মার্চ ২০১০, পৃ. ১২

সেবা, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, যানবাহন-ব্যবস্থা এবং বাজার-ব্যবস্থার মতো অধিক সংখ্যক সরকারি কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ সঠিক তথ্য পেলে তারা তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ও তথ্য প্রদান পদ্ধতি

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৮ অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত ফরমে নির্ধারিত ফরমেটে হতে হবে। তবে ফরম মুদ্রিত বা সহজলভ্য না হলে সাদা কাগজে, ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলেও তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাবে। তবে উল্লিখিত অনুরোধে অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা; যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা; অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি এবং কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী তার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেয়া, নোট নেয়া বা অন্য কোনো অনুমোদিত পদ্ধতি উল্লেখ থাকতে হবে। তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের কর্তব্যসমূহ

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জনসাধারণকে তথ্য প্রদানের সাধারণ বিধান হলো, প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের জন্য নিয়োজিত থাকবেন, যিনি জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনের বিধান ও ব্যতিক্রমসমূহ অনুসরণপূর্বক কাঙ্ক্ষিত তথ্য নির্ধারিত ফি গ্রহণপূর্বক সরবরাহ করবেন। তথ্য অধিকার আইনের ৯ ধারায় বলা হয়েছে, তথ্যের জন্য কোনো নাগরিকের কাছ থেকে অনুরোধ পাবার ২০ দিনের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সেই তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে সরবরাহ করতে হবে। তবে যে তথ্য চাওয়া হয়েছে তা যদি অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হয় তাহলে এই সময় ৩০ দিন পর্যন্ত বেড়ে যাবে। আর যদি কোনো কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করতে না পারে তাহলে তার কারণ উল্লেখ করে আবেদন পাবার ১০ দিনের মধ্যে তা অনুরোধকারীকে জানাতে হবে। অবশ্য আইনের ৯(৪) ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো তথ্য কোনো ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেপ্তার বা কারাগার থেকে মুক্তি সংক্রান্ত হয় তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে অন্তত প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

তথ্য দেয়ার এই সময়সীমার মধ্যে যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করতে অপরাগ হন তাহলে ধরে নেয়া হবে যে, তিনি এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বিধান করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ থেকে অনধিক ২০ কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য

সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করার এবং সেক্ষেত্রেও ব্যর্থ হলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে।

কোনো ব্যক্তি তার অনুরোধকৃত তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে না পেলে অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদন পাননি বা হারিয়ে গেছে বলে জানালে বা তার দেয়া কোনো সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে তিনি পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে যে সংস্থার কর্তৃপক্ষের (ইউনিটের) কাছে তথ্য চাওয়া হয়েছে, আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী সেই সংস্থা বা ইউনিটের ঠিক ওপরের কার্যালয়ের কাছে আপিল করতে পারবে। এই আপিল পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিবে অথবা আপিল আবেদনটি অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে তা খারিজ করে দিতে পারে। তথ্য কমিশন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমন জারী ও শুনানী গ্রহণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া অনুসরণ পূর্বক অভিযোগ নিস্পত্তি করবে, তবে জনগণের অনুরোধে তথ্য সরবরাহের জন্য প্রতিটি দপ্তর যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্য সংরক্ষণ করবে এবং তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ছাড়াও স্ব-প্রণোদিতভাবে তাদের কর্মকাণ্ড জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করবে।[৩]

তথ্য প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা

(ক) তথ্য গোপন রাখার বিধান

তথ্য আইন অনুযায়ী আবেদনকারী সর্বনিম্ন ২০ দিন এবং সর্বোর্চ ২১০ দিনের মধ্যে তথ্য পেয়ে যাবে। যদিও তথ্য আইনে সরকারি বেশিরভাগ তথ্যই জনগণের জানার আওতায় আনা হয়েছে কিন্তু ৭ ধারা মোতাবেক কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম করা হয়েছে। অর্থাৎ কিছু কিছু তথ্য সরকার এখনো গোপন রাখতে পারে যেমন: বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষতিসাধন করতে পারে, অন্য কোনো দেশ বা আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষতি করতে পারে, কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে অন্য কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে আইনের প্রয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এ ধরনের তথ্য। এসব তথ্য কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো নাগরিককে দিতে বাধ্য হবে না।

(খ) যে ক্ষেত্রে তথ্য আইন প্রযোজ্য নয়

তথ্য আইন অনুযায়ী সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে এ আইন বলবৎ হবে। তবে ৩২ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কাজে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যেমন: এনএসআই, ডিজিএফআই, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিট, সিআইডি, এসএসএফ,

---

[৩]. তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন- ২০১১, *তথ্য কমিশন*, প্রকাশকাল: ১৫ মার্চ - ২০১২, পৃ. ১২

স্পেশাল ব্রাঞ্চ, র‍্যাবের গোয়েন্দা সেল এবং রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেল-এর ক্ষেত্রে এ আইন প্রযোজ্য নয় এবং তাদের কাছ থেকে জনগণ তথ্য চাইতে পারবে না।

এছাড়া ১৯৭২ সালের সাক্ষ্য আইন মোতাবেক রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি যা দ্বারা গণস্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে এমন সাক্ষ্য প্রদানে বাকবাধকতা রয়েছে। এই আইনের ১২৩ ধারায় বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তার অনুমতি ছাড়া রাষ্ট্রীয় বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত অপ্রকাশিত সরকারি দলিল থেকে কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিতে অনুমতি দেয়া যাবে না। এছাড়া ১২৪ ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রকাশ করলে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনো তথ্য গোপনীয়ভাবে প্রাপ্ত সরকারি খবর প্রকাশ করার জন্য কোনো সরকারি কর্মচারীকে বাধ্য করা যাবে না। একই ভাবে ১৬২ ধারায় আদালতে সাক্ষী যে কোন ধরনের দলিল দাখিল করতে পারবে এ বিষয়ে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে দলিলটি যদি রাষ্ট্রীয় বিষয় সংক্রান্ত না হয়, তবে প্রয়োজনবোধে আদালত তা পরিদর্শন করতে পারবেন এবং এর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে অন্য সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারবেন।

তথ্য কমিশন ও এর ভূমিকা

তথ্য অধিকার আইনকে কার্যকর করার জন্য একটি তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে। তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা। তথ্য কমিশনের গঠন পদ্ধতি, দায়িত্ব-কর্তব্য, ক্ষমতা, কর্মপরিধি, প্রশাসনিক বিষয় ইত্যাদি এ আইনে বর্ণিত আছে।

তথ্য কমিশনের ক্ষমতা

তথ্য আইনের ১৩ ধারায় তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। তথ্য কমিশন এ আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান এবং নিষ্পত্তি করতে পারবে। যথা-

(ক) কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা কিংবা তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করা;

(খ) কোনো তথ্য চাহিদা প্রত্যাখ্যাত হলে;

(গ) তথ্যের জন্য অনুরোধ করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো জবাব বা তথ্য না পেলে;

(ঘ) কোনো তথ্যের জন্য এমন অংকের মূল্য দাবি করা বা প্রদানে বাধ্য করা যা তার বিবেচনায় যৌক্তিক নয়;

(ঙ) অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হলে বা যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বলে মনে হলে;

(চ) এ আইনের অধীন তথ্যের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন বা তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কিত অন্য যে কোনো বিষয়।

তথ্য কমিশন স্ব-প্রণোদিত হয়ে বা কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে এ আইনের অধীন উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারবে। নিম্নলিখিত বিষয়ে ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন একটি দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে তথ্য কমিশন এই ধারার অধীন সেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে। যথা-

(ক) কোনো ব্যক্তিকে তথ্য কমিশনে হাজির করার জন্য সমন জারি করা এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ-দলিল বা অন্য কোনো কিছু হাজির করতে বাধ্য করা;

(খ) তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা;

(গ) হলফনামাসহ প্রমাণ গ্রহণ করা;

(ঘ) কোনো অফিসের কোনো তথ্য আনয়ন করা;

(ঙ) কোনো সাক্ষী বা দলিল তলব করে সমন জারি করা; এবং

(চ) এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোনো বিষয়।

অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোনো অভিযোগ অনুসন্ধানকালে তথ্য কমিশন বা ক্ষেত্রমত প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনার কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষিত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট যে কোনো তথ্য সরেজমিনে পরীক্ষা করতে পারবে।

তথ্য কমিশনের কার্যক্রম

তথ্য আইনের ১৩ (৫) ধারা অনুযায়ী তথ্য কমিশনের কার্যাবলি হবে নিম্নরূপ। যথা:

(ক) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;

(খ) কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে অনুরোধের পদ্ধতি নির্ধারণ ও তথ্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ;

(গ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিমালা এবং নির্দেশনা প্রণয়ন ও প্রকাশ;

(ঘ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বা বলবৎ অন্য কোনো আইনের ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং বাস্তবায়নের জন্য অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীকরণার্থে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে বাধাসমূহ চিহ্নিত করা এবং প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ প্রদান;

(চ) তথ্য অধিকার বিষয়ক চুক্তিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির উপর গবেষণা করা এবং বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ প্রদান;

(ছ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলের সাথে বিদ্যমান আইনের সাদৃশ্যতা

পরীক্ষা করা এবং বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে তা দূরীকরণার্থে সরকার বা ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(জ) তথ্য অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক দলিল অনুসমর্থন বা তাতে স্বাক্ষরে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঝ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানকে উক্তরূপ গবেষণা পরিচালনায় সহায়তা প্রদান;

(ঞ) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনা ও অন্যান্য উপায়ে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(ট) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

(ঠ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মরত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

(ড) তথ্য অধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপের আয়োজন এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার;

(ঢ) তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষকে কারিগরী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;

(ণ) তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি ওয়েব পোর্টাল স্থাপন;

(ত) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে অন্য কোনো আইনে গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা।

তথ্য কমিশন কর্তৃক অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ পদ্ধতি

তথ্য আইনের ২৫ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক নিম্ন লিখিত যে কোনো কারণে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেঃ

(ক) ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কারণে তথ্য প্রাপ্ত না হলে;

(খ) ধারা ২৪ এর অধীন প্রদত্ত আপিলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে;

(গ) ধারা ২৪ এর উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রাপ্তি বা ক্ষেত্রমত তথ্য প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্তপ্রাপ্ত না হলে।

ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিষয়ে যে কোনো সময় এবং ধারা ২৪ এ উল্লিখিত বিষয়ে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ বা ক্ষেত্রমত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার তারিখ হতে পরবর্তী ৩০দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। তথ্য কমিশন যুক্তিসংগত কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও অভিযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। কোনো অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোনো

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ আইনের বিধানাবলি অনুসরণে করণীয় কোনো কাজ করতে ব্যর্থ হলে তথ্য কমিশন উক্ত কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমত, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে। অভিযোগ প্রাপ্তির পর প্রয়োজন হলে প্রধান তথ্য কমিশনার উক্ত অভিযোগটি অনুসন্ধান করবে বা অনুসন্ধানের জন্য অন্য কোনো তথ্য কমিশনারকে দায়িত্ব প্রদান করবেন। কোনো অভিযোগের অনুসন্ধানকালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করতে হবে। কোনো অভিযোগের বিষয়বস্তুর সাথে তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকলে তথ্য কমিশন উক্ত তৃতীয় পক্ষকেও বক্তব্য পেশ করার সুযোগ প্রদান করবে। প্রাপ্ত অভিযোগ তথ্য কমিশন সাধারণভাবে ৪৫দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করবে, তবে অভিযোগ নিস্পত্তির সময়সীমা, বর্ধিত সময়সহ কোনমেই সর্বমোট ৭৫দিনের বেশি হবে না।

তথ্য প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য জরিমানা

তথ্য কমিশন যদি মনে করে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইন অমান্য করেছেন তাহলে তাকে জরিমানা করতে পারবে। তথ্য আইনের ২৭ ধারায় জরিমানা সংক্রান্ত বিধানের কথা বলা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান বা এ বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত জানতে না পারলে কিংবা ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করলে কিংবা তথ্য প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তাকে তথ্য দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট দিনের পর থেকে প্রতিদিন ৫০ টাকা করে অনধিক ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা তথ্য কমিশন আরোপ করতে পারবে, তবে ২৯ ধারা মোতাবেক তথ্য কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কেউ কোনো আদালতে আপিল করতে পারবে না। তবে সংবিধানের ১০৩ ধারা অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উচ্চ আদালতে রিট করতে পারবে।

তথ্য অধিকার আইন ও সামাজিক বাস্তবতা

২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হলেও এই ৩ বছরে এ আইন সম্পর্কে সাধারণ জনগণ এখনও সচেতন নয়। আইনটি তথ্য দেয়ার জন্য যে সুযোগ, ব্যবস্থা এবং পদ্ধতি চালু করেছে সে সম্পর্কে সকল পর্যায়ে ব্যাপক জনসচেতনতার অভাব রয়েছে। তথ্য মাধ্যম সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত ও দুর্নীতির খবর মানুষকে দিতে পারে এবং অধিকার রক্ষায় মানুষকে সচেতন করতে পারে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে, তথ্য চাওয়া থেকে শুরু করে তথ্য পাওয়া পর্যন্ত যা কিছু করতে হবে তা আইন অনুযায়ী করার জন্য যে ধরনের জ্ঞান এবং দক্ষতার প্রয়োজন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে তা পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই।[৪] তথ্য কমিশন গঠন হলেও এখনও সুসংগঠিত হতে পারেনি। কমিশন নিজস্ব

---

[৪]. ফারজানা আফরোজ, *বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন: শঙ্কা ও সম্ভাবনা*, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২০ নভেম্বর- ২০১০, পৃ. ৬

ওয়েবসাইটও চালু করেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও কর্পোরেট সংস্থাও তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তথ্য প্রাপ্তির জন্য আগ্রহী জনগণ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য চেয়ে না পেয়ে দাখিলকৃত আবেদনের কপি তথ্য কমিশনে আসছে। এসব তথ্যকে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করার জন্যও প্রয়োজন হবে দক্ষতা এবং জনবল। যতক্ষণ পর্যন্ত তথ্য প্রদানে দক্ষ জনবল নিয়োগ করা না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তথ্য আইনের বাস্তব প্রয়োগ হবে না।

কমিশন প্রতিষ্ঠার পর হতে তথ্য কমিশনে সর্বমোট ১০৪ টি অভিযোগ দাখিল করা হলে কমিশনের বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ৪৪ টি অভিযোগ আমলে আনা হয়। ৬০ টি অভিযোগ ক্রটিপূর্ণ বিবেচনায় কমিশনের সভায় আমলে গ্রহণ করা হয়নি। এরূপ ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ গ্রহণ না করার কারণ পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।[৫]

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা

তথ্য অধিকার আইন পাশ হওয়ার পর আইনটি বাস্তবায়নের পথে যে সকল প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় তা নিম্নরূপ:

১. শহরকেন্দ্রিক জনসচেতনতা

তথ্য অধিকারের বিষয়টি মূলত রাজধানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। শহরের সুশীল সমাজ তথ্য অধিকার সম্পর্কে যতটা সচেতন তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ মানুষ ততটা সচেতন ও আগ্রহী কোনটাই নয়।[৬] তথ্য অধিকার আইন ও এর ব্যবহার সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশ অবহিত নয়। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশের মাঝেও তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই। কমিশনে দায়েরকৃত অর্ধেকের বেশি অভিযোগ ক্রটিপূর্ণ বিবেচিত হওয়ার পেছনেও আইনটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকাই প্রধান কারণ।

২. তথ্য সংরক্ষণ ও চিহ্নিতকরণের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা

আমাদের দেশে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। সংরক্ষণের অভাবে অনেক তথ্য নষ্ট হয়ে যায়। তথ্য শ্রেণিবদ্ধ করা বা সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থাও আমাদের দেশে দুর্বল। এর ফলে কখনো কখনো প্রার্থিত তথ্য খুঁজে পাওয়া সময়সাধ্য হয়ে পড়ে আবার কখনো খুঁজে পাওয়াই

---

[৫]. তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন- ২০১১, *তথ্য কমিশন*, প্রকাশকাল : ১৫ মার্চ, ২০১২, পৃ. ৮৯

[৬]. এম আজিজুর রহমান, '*তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতার অভাব রয়েছে*, দৈনিক প্রথম আলো, ২৭ ডিসেম্বর- ২০০৯, পৃ. ১২

যায় না। এর ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহ করতে সমস্যায় পড়তে হয়। তথ্য অধিকার আইনের সফলতার অনেকাংশই নির্ভর করবে তথ্য সংরক্ষণ ও সহজে চিহ্নিতকরণের উপর। কিন্তু আমাদের দেশে বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ে তথ্য বা দলিল-দস্তাবেজ সঠিক পন্থায় সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা নেই। এ বিষয়ে সম্প্রতি আইন প্রণীত হলেও তা এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। অথচ কোন বিষয় যাতে দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করে রাখা যায় সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلَا تَسْأَمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ "ছোট বিষয় হোক কি বড় মেয়াদসহ তা লিখে রাখতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হবে না"।[৭] কাজেই তথ্য সংরক্ষণ করার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩. তথ্য অধিকার আইন চর্চার ক্ষেত্রে অনীহা

আমাদের দেশে দীর্ঘদিনের গোপনীয়তার সংস্কৃতি চর্চার কারণে তথ্য অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে বেশ অনীহা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন অনুসারে নির্ধারিত ফরমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হলে আবেদনকারীকে যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করা এবং সম্ভব না হলে অপারগতার নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেয়া তথ্য অধিকার চর্চার অংশ। কিন্তু অনেক দপ্তরে তথ্য অধিকারের আবেদনপত্র গ্রহণ করতেই আপত্তি দেখা যায়। তথ্য প্রদানে ব্যর্থতার জন্য অপারগতার নোটিশ প্রদানের কোন নজির সচরাচর দেখা যায় না। পাশাপাশি তথ্যের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রেও তথ্য প্রত্যাশী অনেকেই অনীহা প্রদর্শন করেন।

৪. তথ্য প্রকাশ ও সংরক্ষণের অভাব

তথ্য অধিকার আইনের সুস্পষ্ট বিধান এবং তথ্য কমিশন হতে প্রবিধানমালা জারি করা সত্ত্বেও স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি দপ্তরসমূহ তেমন তৎপরতা প্রদর্শন করছে না। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ বা অন্য কোনো মাধ্যমে তথ্য প্রকাশের প্রবণতাও সকল দপ্তরের মাঝে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আধুনিক প্রক্রিয়ায় তথ্য সংরক্ষণের অভাবে দপ্তরসমূহে আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্য সরবরাহে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।

৫. সকল দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না হওয়া

সরকারের সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত বা অধীনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে এবং সকল বেসরকারি সংস্থায় তথ্য কর্মকর্তা বা তথ্য দেয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়োগ এবং তাদের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর বা

---

[৭]. আল-কুরআন, ২ : ২৮২

ই-মেইল ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য অবহিতকরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের ব্যাপক আগ্রহ থাকলেও এ সকল প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে না। এছাড়া বিপুল সংখ্যক বেসরকারী সংস্থা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের বিষয়ে আগ্রহ প্রদর্শন করছে না। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা না থাকায় তথ্য প্রত্যাশী জনসাধারণ তথ্যের জন্য আবেদন করতে প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এ বিষয়ে ইসলামে তথ্য সরবরাহে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন- فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো"।[৮] মহানবী স. বলেছেন, "তোমাদের যা মনে চায় আমার কাছে জিজ্ঞেস করো"।[৯]

৬. প্রশাসনিক অভ্যন্তরীণ কুফল

তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্তৃপক্ষের কোনো অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রশাসনিক অভ্যন্তরীণতার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া তথ্য প্রদান করতে চান না। এতে তথ্য প্রদানে বিলম্ব ঘটে এবং তথ্য প্রদান প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে সাধারণ জনগণ সময় মত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে না।

৭. পর্যাপ্ত প্রযুক্তি ব্যবস্থার অভাব

তথ্য গ্রহণকারী এবং প্রদানকারী উভয়ের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি সংযোগের অপর্যাপ্ততা রয়েছে। বর্তমানে সরকারি, বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে তথ্য সংরক্ষণের ডিজিটাল পদ্ধতি কার্যকর নেই। এছাড়া অধিকাংশ দপ্তরে ফটোকপি মেশিন না থাকায় তথ্য সরবরাহ করার জন্য ফটোকপি করার প্রয়োজন হলে দাপ্তরিক নথিপত্র দোকান থেকে ফটোকপি করতে হয়। এর ফলে নথির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেক দপ্তরে কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার এবং ইন্টারনেট সুবিধা না থাকায় তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যা হয় যা তথ্য প্রদান প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে।

৮. তথ্য অধিকার আইনের অস্পষ্ট বিধান

তথ্য অধিকার আইনের কতিপয় ধারা ও উপ-ধারা সম্পর্কে অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি রয়েছে। বিশেষ করে আপিল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ এবং তথ্য প্রদান স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমতি গ্রহণের বিষয়টি সুস্পষ্ট না থাকায় তথ্য কমিশনকেও

---

৮. আল-কুরআন, ২১ : ৭

৯. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-ইলম, অনুচ্ছেদ : আল-গাদাব ফিল মাওইযাহ ওয়াত তা'লীম ইযা রাআ মা-ইয়াকরাহু, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০, পৃ. ১১

অনেক সময় সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয়। এছাড়া সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত, সরকারি লাইসেন্স ও ভর্তুকী গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত হওয়া নিয়েও অস্পষ্টতা রয়েছে যা তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করছে।

৯. অপর্যাপ্ত জরিমানা

তথ্য আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদান না করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জরিমানার বিধান থাকলেও জরিমানার পরিমাণ অনেক কম (৫০০০/- টাকা)। ইচ্ছা করে দেরি করলে প্রতিদিন ৫০/-টাকা জরিমানা। আমাদের দেশে যেখানে দুর্নীতি অনেক বেশি, তাই এ জরিমানা অনেক কম। এছাড়া এ পরিমাণ জরিমানা অনেকেই দিতে পারবে। জরিমানার পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে।

কতিপয় সুপারিশ

১. তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি

তথ্য অধিকার আইন পরিপূর্ণ বাস্তাবায়ন না হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ আইনটি সম্পর্কে কর্মকর্তা ও জনসাধারণের মাঝে সঠিক ধারণা না থাকা। সেকারণে তথ্য অধিকার আইন ও নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি জানানো ও সচেতন করার জন্য ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা প্রয়োজন। সর্ব শ্রেণির মানুষ বিশেষ করে গ্রামীণ প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগণকে তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা অত্যন্ত জরুরি। আইনটির উপযোগিতা, সুফল ও তথ্যগত সেবা পাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি তৃণমূল পর্যায়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণার ব্যবস্থা করলে আইনটি নিজস্ব লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যাবে। পাশাপাশি প্রতি জেলায় একজন করে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক পরামর্শক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

২. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

আইনের বিধান অনুসারে প্রতিটি সরকারি, বেসরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত অফিসের দৃশ্যমান স্থানে 'তথ্য প্রদান শাখা' স্থাপন করাসহ সেখানে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োজিত করতে হবে। প্রত্যেক ইউনিটে তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পাশাপাশি একজন করে বিকল্প কর্মকর্তা নিয়োগ করা প্রয়োজন যাতে একজনের অনুপস্থিতি বা অসুস্থতার সময়কালে তথ্য আবেদনকারী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। জনগণের সুবিধার্থে নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা ইত্যাদি তথ্যসহ প্রচারপত্র প্রকাশ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপিল কর্তৃপক্ষ এবং অভিযোগ কর্তৃপক্ষের ঠিকানাসহ বোর্ড টাঙ্গানো নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করার জন্য কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়েও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

৩. তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা করা

তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা অনুসারে সকল দপ্তর কর্তৃক স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের কার্যক্রম নিশ্চত করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সকল মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তরগুলোকে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। মন্ত্রণালয় ও স্ব-স্ব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মবৃত্তে তথ্য অধিকার ব্যবস্থাকে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ নিলে এটি আরো শক্তিশালী হবে। স্ব-স্ব সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও কমিটমেন্ট তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪. তথ্য অধিকার আইনের সাথে সাংঘর্ষিক আইন সংস্কার

তথ্য অধিকার আইনের সাথে যে সকল আইন (বিশেষত অফিসিয়াল গোপনীয় আইন ১৯২৩, বিভিন্ন বিজনেস রুলস) সাংঘর্ষিক সেগুলো আইন সংস্কারের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার সহজ করা প্রয়োজন। অফিসিয়াল গোপনীয় আইন, ১৯২৩ বলবৎ থাকায় তথ্য প্রদানের সীমাবদ্ধতা ও সুযোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন।

৫. তথ্য অধিকার আইনের সীমাবদ্ধতা দূর করা

তথ্য অধিকার আইন সংশোধন করে এর দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করা প্রয়োজন। তথ্য প্রাপ্তির সময়সীমা কমিয়ে আনা, আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ সম্পর্কে অস্পষ্টতা দূরীকরণ, তথ্য না প্রদান সংক্রান্ত তালিকা হ্রাস করা, সরকারি অনুদান ও ভর্তুকি গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনা, আইনের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা, তথ্য কমিশনের জরিমানা আরোপ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আইনটি সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

এছাড়া আপিলেট অথরিটি অর্থাৎ প্রশাসনিক প্রধানের বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। আপিলেট অথরিটি ডেলিগেট করার বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। তথ্য সরবরাহের ব্যাপারে প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি বিবেচনার অবকাশ আছে বলে মনে হয়। সব তথ্য সবার জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। সেহেতু আবেদনের ফরমে তথ্য নেয়ার 'উদ্দেশ্য' উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। আপিল নিষ্পত্তির জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানের দায়িত্ব প্রয়োজনবোধে বিশেষ ক্ষেত্রে ডেলিগেট করার সুযোগ থাকা প্রয়োজন। ত্রুটিপূর্ণ আবেদনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত আবেদনপত্রের মাধ্যমে পুনরায় তথ্যের জন্য আবেদন করার বিধান রাখা প্রয়োজন। এছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদেয় তথ্য বিকৃত করে যে কোনো মাধ্যমে বা সরাসরি প্রকাশ করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ তথ্য অধিকার আইনটিতে রাখা যেতে পারে।

৬. তথ্য কমিশনের বিপুল সংখ্যক কার্যালয় স্থাপন

তথ্য পাওয়ার দীর্ঘ প্রক্রিয়া দূর করতে প্রত্যেক বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে তথ্য কমিশনের কার্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে। কারণ তথ্য সেবাকে জনগণের কাছে সহজলভ্য করা

প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনমান উন্নয়ন, কৃষি প্রযুক্তি, দ্রুত সেবা লাভ কার্যক্রম, চিকিৎসা, জেলা ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের তথ্যভিত্তিক ওয়েবসাইটগুলোর তথ্য সমৃদ্ধকরণের কাজ জোরদার করা অত্যন্ত জরুরি। তবেই তথ্য আইনের উদ্দেশ্য সফল হবে।

৭. তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার প্রচলন

তথ্য সংরক্ষণ ও সহজে চিহ্নিতকরণের জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন। দ্রুত তথ্য প্রদানের প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের সিলেবাসে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। এছাড়া তথ্য প্রদান ও গ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন সংবিধানের প্রত্যাশার সাথে সংগতিপূর্ণ। কিন্তু তথ্য অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের দেশ বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে ব্যক্তিগত, সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কিভাবে সুফল পাওয়া যায় সে বিষয়ে জনসাধারণ সুস্পষ্ট ধারণা ও কার্যকর কৌশল এখনো রপ্ত করতে পারেনি। সেজন্য তথ্য আইনটি বাস্তবায়নের জন্য তথ্য জানতে আগ্রহী পক্ষ, তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এবং যে পক্ষ তথ্য সংরক্ষণ করবে তাদের সমানভাবে তথ্য আইন ও বিধির ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষতা ও পরিস্কার ধারণা থাকতে হবে। আর তা যদি নিশ্চিত করা যায় তাহলে সমাজের অবহেলিত ও পিছিয়ে থাকা লোকজন তথ্য অধিকার আইনটি কাজে লাগিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে। প্রতিষ্ঠার তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও তথ্য কমিশন এখনো শাসন ব্যবস্থার মূল ধারার একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। জনসাধারণের বড় অংশের অসচেতনতা, আইনটি প্রচারে অপর্যাপ্ত গৃহীত ব্যবস্থাপনা, আইন বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের অসম্পূর্ণতা, আইন ব্যবহারে পরামর্শমূলক ও উৎসাহমূলক কর্মকাণ্ডের অনুপস্থিতি এবং তথ্য কমিশনের অপর্যাপ্ত জনবল এবং কর্মকাণ্ডের সীমাবদ্ধতা তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এসকল সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, দেশ প্রেমিক সচেতন জনগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। আশা করা যায়, উপরে বর্ণিত পরামর্শের আলোকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের চাহিদা পূরণ হবে, সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮ সংখ্যা-৩২
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১২

সম্পদে নারীর অধিকার : বাংলাদেশের সংবিধান ও ইসলামী আইনের আলোকে একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক*

[**সারসংক্ষেপ :** *বর্তমান বিশ্বে যে সকল বিষয় নিয়ে অত্যন্ত চটকদার শ্লোগান উচ্চারিত হচ্ছে, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম হচ্ছে এবং ব্যয় করা হচ্ছে লক্ষ-কোটি বিলিয়ন ডলার তন্মধ্যে সম্পদে 'নারী অধিকার' ইস্যুটি অন্যতম। ইসলাম বিদ্বেষী দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা একযোগে তাদের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করে উক্ত ইস্যুটিকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগারের মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছে। মানব ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সম্পদে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৃথিবীতে বিভিন্ন সময় সমাজ, সভ্যতা, সংস্থা ও ধর্মে জোরালো দাবি উঠে কিন্তু তা কার্যত অমীমাংসিতই থেকে যায়। অন্য দিকে তদানীন্তন আরব সমাজে নিগৃহীত ও উপেক্ষিত নারীদের সম্পদে অধিকার সম্পর্কে ইসলাম সুস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। দীর্ঘকাল থেকে পৃথিবীতে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিধান রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত না থাকায় ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় 'সম্পদে নারীর অধিকার' বিষয়টিও মানুষ যেন ভুলতে শুরু করেছে। এর ফলে একদল মুসলিমও প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং ইসলামকে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার জন্য সেকেলে ও পরিত্যক্ত মনে করছে। তাই বিষয়টি বর্তমান প্রেক্ষিতে আলোচনার দাবি রাখে। কাজেই অত্র প্রবন্ধে বাংলাদেশের সংবিধানে সম্পদে নারীর অধিকার, বাংলাদেশের নারী সমাজ, সম্পদ-এর পরিচয়, কন্যা সন্তানের গুরুত্ব, বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় সম্পদে নারীর অধিকার, জাহিলী যুগে সম্পদে নারীর অধিকার, ইসলামী সমাজব্যবস্থায় নারীর সম্পদ লাভের ক্ষেত্রসমূহ, মীরাসী আইন সম্পর্কে বিভ্রান্তির অপনোদন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।*]

বাংলাদেশের সংবিধানে সম্পদে নারীর অধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সম্পদে নারীর অধিকার বিষয়টি স্বীকৃত। নিম্নে বর্ণিত ধারাসমূহ পাঠান্তে তা সহজে বুঝা যাবে-

ধারা – ১০ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে-

ধারা –২৭ সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

ধারা– ২৮ (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

ধারা-২৯ (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

বাংলাদেশের নারী সমাজ

বাংলাদেশের ৬৩% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। দরিদ্র পরিবারে উপার্জনক্ষম পুরুষ সদস্যের মর্যাদা নারীর তুলনায় বেশী। এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উপার্জনক্ষম পুত্র সন্তান, তারপর মা, দাদী এবং তারপরে কন্যা সন্তানের স্থান। সুতরাং নারী সদস্য পরিবারে অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্র থেকে যায়। ইসলামী শরীয়ত মতে পিতার সম্পদের অংশ ও স্বামীর নিকট থেকে প্রাপ্ত দেনমোহর যদিও নারীর পাবার কথা, কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা অনেক ক্ষেত্রে তদনুরূপ নয়। আমাদের সমাজব্যবস্থায় হিন্দু মেয়েরা যেহেতু পিতার সম্পত্তির অংশ পায় না, তাই তাদের বিবাহের সময় যথাসম্ভব যৌতুক প্রদান করা হয়। এই নিয়ম ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়ে ক্রমশ সংক্রমিত হচ্ছে। ফলে যৌতুক দিতে না পারায় দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের যথাসময়ে বিবাহ হচ্ছে না। কখনো বিবাহ হলেও যৌতুক দিতে না পারায় প্রতিনিয়ত তারা নিগৃহীত হচ্ছে, আবার কখনো যৌতুকের বলির শিকার হচ্ছে। এই অমানবিক অবস্থা উত্তরণের লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে যৌতুক বিরোধী আইন পাশ করা হয়। কিন্তু আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় সমস্যা দিন দিন ঘনীভূত হচ্ছে। ১৯৮৩ সালে Cruelty to women ordinance পাশ করা হয়, যা ১৯৮৫ সালে আইনে পরিণত হয়। এতেও অবস্থার খুব একটা উন্নতি ঘটেছে এমনটি বলা যায় না। আমরা পত্র-পত্রিকায় নারী নির্যাতনের যে চিত্র লক্ষ্য করি তন্মধ্যে যৌতুকের দাবি সংক্রান্ত বিষয় অন্যতম। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে নারীকে নিষ্ঠুর ও অমানবিক শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়, অথচ পুরুষ অনেক ক্ষেত্রে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে

থেকে যায়। আর পুরুষ প্রভাবশালী পরিববারের হলে তো কথাই নেই। এর পেছনে ইসলাম সম্পর্কে একদল অজ্ঞ লোকের ফাতওয়াও কম দায়ী নয়।[১]

বাংলাদেশে যে সব বিষয় নিয়ে খুব বেশি সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও লেখালেখি হয় - এককথায় গলা ফাটিয়ে উচ্চৈঃস্বরে অধিকারের আওয়াজ তোলা হয় তা হ'ল, নারী বৈষম্যের শিকার, নারী প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে উপেক্ষিত কিংবা বলা হয়, নারী সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত। নারীদের ব্যাপারে যে সব লোক এহেন কুম্ভিরাশ্রু ছড়ায় তাদের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট, প্রায়শ দৈনিক পত্র-পত্রিকায় নারী নিগৃহীত হওয়ার যে চিত্র আমাদের সামনে ভেসে উঠে তার ৯৯% নারী নির্যাতনের ঘটনা তাদের দ্বারাই নিজ পরিবার ও কর্মস্থলে সংঘটিত হয়। তারা নারী অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানের নামে কখনো তাদের সম্ভ্রম হানি করে, দেনমোহর থেকে বঞ্চিত করে এবং কখনো যৌতুক প্রদানে বাধ্য করে। এর অন্যথা হলে তারা নারীদের জীবন সংহার করতেও দ্বিধাবোধ করে না। পক্ষান্তরে আমাদের দেশে যারা কুরআন-হাদীসের বিধানের প্রতি ঈমান রাখে এবং আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতায় বিশ্বাসী তাদের দ্বারা নারী অধিকার হরণ হওয়ার চিত্র খুব কমই দেখা যায়। আর তারাই নারী অধিকার নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকেন ব্যক্তিগত জীবনে এবং বৃহত্তর জীবনের সকল ক্ষেত্রে। মোটকথা, যারা কুরআন-হাদীসের জ্ঞান রাখেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত ও রসূল স. প্রদর্শিত পথে চলা নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নিয়েছেন কেবল তাদের দ্বারাই নারী অধিকার সর্বতোভাবে নিশ্চিত হতে পারে। এক্ষেত্রে নারী অধিকার সুরক্ষার পক্ষের ও অধিকার হরণকারীদের চিনে রাখা একান্ত প্রয়োজন, অন্যথায় নারী সমাজ মানব রূপী হায়েনাদের দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রতারিত হতেই থাকবে।

নারী সমাজ যে সকল ক্ষেত্রে সম্পদ লাভ করে তা হলো : বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় সম্পদে নারীর অধিকার, জাহিলী যুগে সম্পদে নারীর অধিকার, ইসলামী সমাজব্যবস্থায় নারীর সম্পদ লাভের ক্ষেত্রসমূহ, মীরাসী আইন, মীরাস সম্পর্কে বিভ্রান্তির অপনোদন অন্যতম, তবে মূল আলোচনা শুরু করার পূর্বেই 'সম্পদ' ও কন্যা সন্তানের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন ।

সম্পদ (মাল)-এর পরিচয়

'মাল' (المال) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ধন, সম্পদ, সম্পত্তি ইত্যাদি। যেমন-

১. মানুষের মালিকানাধীন বস্তুকে মাল বলে। অর্থাৎ 'মাল' এমন বস্তু যার প্রতি মানুষ স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়, যা সঞ্চয় করা যায়, যেমন- নগদ জিনিস (টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা ইত্যাদি) এবং যা নগদ জিনিসের বিকল্প হতে পারে।[২]

---

[১]. ইউ. এ. বি. রাজিয়া আকতার বানু, সংবিধানে ও ধর্মে বাংলাদেশে মুসলিম নারীর অধিকার ও মর্যাদা ঃ একটি পর্যালোচনা, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* ঢাকা : দ্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৪, পৃ. ৬৯

[২]. ড. রাওয়ান ও হামিদ সাদিক, *মুজা'মু লুগাতিল ফুকাহা,* করাচী : তা. বি., পৃ. ৩৯৬

২. যেমন বলা হয়, তুমি যে সমস্ত জিনিসের মালিকানা লাভ করেছ তাই মাল (সম্পদ)।[৩] ইসলামের দৃষ্টিতে কোন বস্তুর মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলে তাকে 'মাল' (সম্পদ) হিসাবে গণ্য করা হয়। (ক) জিনিসটি ব্যবহারযোগ্য, অন্য কথায় বলা যায়, জিনিসটি মানুষের জন্য উপকারী হতে হবে; (খ) জিনিসটির ব্যবহার শরীয়তে অনুমোদন করা হয়েছে এমন হতে হবে। অন্য কথায় বলা যায়, শরীয়ত জিনিসটির ব্যবহার নিষিদ্ধ করেনি। অতএব যে জিনিস ব্যবহারযোগ্য নয় অথবা যার ব্যবহার শরীয়তে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা 'সম্পদ' (মাল) নয়। যেমন- মদ, শূকর ইত্যাদি।[৪]

সম্পদের প্রকারভেদ

দুই প্রকার। যথা-

(ক) অস্থাবর সম্পদ : যে সম্পদ অবিকল অবস্থায় এবং তার প্রকৃতির পরিবর্তন না ঘটিয়ে স্থানান্তর করা সম্ভব তাকে অস্থাবর সম্পদ বলে। যেমন গৃহপালিত জীবজন্তু, উৎপাদিত পণ্য, নগদ অর্থ, সোনা-রূপা এককথায় যা সহজেই স্থানান্তর করা যায়।[৫]

(খ) স্থাবর সম্পদ : যে সম্পদ অবিকল অবস্থায় এবং তার প্রকৃতি পরিবর্তন না করে স্থানান্তর করা সম্ভব নয় তাকে স্থাবর সম্পদ বলে। যেমন- জায়গা-জমি, দালান-কোঠা, গাছপালা ইত্যাদি।[৬] উল্লেখ্য যে, উভয় প্রকার সম্পদে নারী-পুরুষ উভয়ের অধিকার রয়েছে, চাই তা কম হোক কি বেশী। কেননা কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে-

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক অথবা বেশীই হোক, এক নির্ধারিত অংশ"।[৭]

এখন আমরা কন্যা সন্তানের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করবো।

কন্যা সন্তানের গুরুত্ব

সন্তান প্রতিপালন করার প্রতি ইসলাম অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে, বিশেষভাবে কন্যা সন্তান প্রতিপালনের জন্য বিপুল সওয়াবের কথা ঘোষিত হয়েছে।

---

[৩]. ইবনে মানযূর, *লিসানুল আরাব*, আল-কাহেরা : দারুল হাদীস, ১৪২৩/২০০৩, খ. ৮, ২য় কলাম, পৃ. ৪০৩

[৪]. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৫/১৯৯৫, খ. ১, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৯৫

[৫]. ড. মুহাম্মদ রাওয়ান ও ড. হামিদ সাদিক, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭

[৬]. প্রাগুক্ত

[৭]. আল-কুরআন, ৪ : ৭

মহানবী স. বলেছেন: "যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করলো, আমি এবং সে কিয়ামতের দিন এভাবে থাকবো-এ কথা বলে তিনি তাঁর দুই হাতের আংগুলগুলো একত্র করে দেখালেন।"[৮]

মহানবী স. আরো বলেছেন: "তোমরা কন্যা সন্তানদের ঘৃণা করো না"।[৯]

মহানবী স. আরো বলেছেন: "হে আল্লাহ! আমি এই দুই প্রকার দুর্বল লোকের অধিকার খর্ব করা নিষিদ্ধ করেছি। তারা হলো, ইয়াতীম ও নারী"।[১০]

ইমরানের স্ত্রী হান্না নিম্নোক্ত ভাষায় আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলেন,

لذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى

"স্মরণ কর, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্তভাবে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট থেকে তা কবূল করো, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। অতঃপর যখন সে তা প্রসব করলো তখন বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। সে যা প্রসব করেছে আল্লাহ তা সম্যক অবগত। আর ছেলে তো এই মেয়ের মত নয়"।[১১]

এই কন্যা সন্তান হযরত মরিয়ম কালক্রমে জগদ্বিখ্যাত মহিয়সী নারী হয়েছিলেন, কুরআন মাজীদে তাঁর উচ্ছসিত প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁর গর্ভে বিশিষ্ট নবী ঈসা আ. জন্মগ্রহণ করেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁর নামে কুরআন মাজীদে 'সূরা মারিয়াম' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরাও নাযিল হয়েছে। সুতরাং কন্যা সন্তানকে কোন পর্যায়ে তুচ্ছজ্ঞান করার অবকাশ নেই।

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় সম্পদে নারীর অধিকার

হিন্দু ধর্মে

ভারতে দায়ভাগ আইনে মৃত ব্যক্তির অন্যান্য পুরুষ উত্তরাধিকারীরা জীবিত থাকলে কন্যাগণ কোন অংশ পায় না। অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের অবর্তমানে কন্যাগণ উত্তরাধিকারী হলেও যে সকল কন্যা বন্ধ্যা কিংবা শুধু কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে তারা

---

৮. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়: আল-বির্‌রু ওয়াস-সিলাতু ওয়াল-আদাব, অনুচ্ছেদ: ফাযলুল ইহ্‌সান ইলাল বানাত, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০, পৃ. ১১৩৬

৯. আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়াইদ*, অধ্যায়: আল-বির্‌র ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ: মা জাআ ফিল আওলাদ, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৪০৮/১৯৮৮, খ. ৮, পৃ. ১৫৬

১০. ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-আদাব, অনুচ্ছেদ: হাক্কুল ইয়াতীম, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০, পৃ. ২৬৯৭

১১. আল-কুরআন, ৩ : ৩৫-৩৬

মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পায় না।[১২] মিতক্ষরা আইনে (মিতক্ষরা পদ্ধতি স্মৃতিকর ঋষি যাজ্ঞবল্কের স্মৃতি শাস্ত্রের প্রচলিত প্রবন্ধ) মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং বিধবা স্ত্রী জীবিত থাকলে কন্যা মৃত পিতার সম্পদে অংশ পায় না। এ আইনের আওতায় কন্যার সম্পদ না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে, কারণ উল্লিখিত ব্যক্তিদের কেউ না কেউ বেঁচে থাকেই।[১৩]

বৌদ্ধ ধর্মে

বৌদ্ধদের পৃথক কোন উত্তরাধিকার আইন নেই। তবে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন দ্বারা শাসিত।[১৪]

ডি এফ মোল্লার Principal of Hindu Law এর অনুচ্ছেদ Persons governed by Hindu Law তে বলা হয়েছে -"Hindu Law applies (iv) to Jaina, Buddhists in India, Sikhs except so far as such Law varied by custom" অর্থাৎ–'ভারতের জৈন, বৌদ্ধ ও শিখ সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব প্রথাসম্মত আইন ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে হিন্দু আইনের আওতাভুক্ত'।[১৫]

ইয়াহূদী ধর্মে

নারীকে ইয়াহূদী ধর্মে সকল পাপের কারণ এবং প্রতারক বলা হয়েছে। ইয়াহূদী ধর্মে পিতা নিজ কন্যাকে বিক্রয় করে দিতে পারতো এবং নারীর কোন উত্তরাধিকার স্বত্ব স্বীকৃত ছিল না।[১৬]

খ্রিষ্ট ধর্মে

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে বসবাসকারী খ্রিষ্টানদের পৃথক কোন উত্তরাধিকার আইন নেই। তবে ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের (Act 93 of 1925) ২৩-২৮ (অংশ-৪) এবং ২৯-৪৯ (অংশ-৫) ধারাসমূহ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতে বসবাসকারী খ্রিষ্টানদের জন্য উত্তরাধিকার আইন সমভাবে প্রযোজ্য। যুক্তরাজ্যের আইন অনুসারে বহু বিবাহের মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী সন্তান উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে না।[১৭] ১৮০৫ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ আইনে স্ত্রীকে বিক্রয় করে দেয়ার স্বামীর

---

[১২]. জাফর আহমাদ, মীরাসী আইন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *ইসলামী আইন ও বিচার*, ঢাকা: ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, বর্ষ-২, সংখ্যা-৮, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ৮৩

[১৩]. প্রাগুক্ত

[১৪]. ১৯২৫ সন, ৩৯ নং আইন

[১৫]. মাওলানা মো: ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয*, ঢাকা: আর আই এস পাবলিকেশন, ১৯৯৫, পৃ. ১৩৬

[১৬]. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ৬২

[১৭]. মাওলানা মো: ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২-৪৩

অধিকার স্বীকৃত ছিল। নারীরা অধিকারহীনা থাকতো এবং নিজ সম্পদও স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ভোগ-ব্যবহার করতে পারতো না।[১৮]

রোমান সভ্যতায়

রোমান সভ্যতায় নারী অন্যের অধীনস্থ ছিল। বিবাহিত নারী এবং তার সম্পদ উভয়ই স্বামীর নিয়ন্ত্রণে থাকতো। নারীর কোন নাগরিক অধিকারও স্বীকার করা হতো না।[১৯]

জাহিলী যুগে সম্পদে নারীর অধিকার

অধিকার বলতে যা বুঝায় মহানবী স.এর নবুওয়াত- পূর্ব আরব সমাজে তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। নারীর উত্তরাধিকার, দেনমোহরের অধিকার কিংবা বিবাহ-তালাক কোন কিছুতে মতামত প্রদানের যেমন কোন সুযোগ ছিল না তদ্রূপ তার কোন অধিকারও স্বীকার করা হতো না। কোন পুরুষ তার স্ত্রী রেখে মারা গেলে ঐ মৃতের অন্য কোন স্ত্রীর ঔরসজাত পুত্র সন্তান থাকলে তখন পিতার পরিত্যক্ত সম্পদের ন্যায় সে তার সৎ মায়ের উত্তরাধিকারী হতো এবং ইচ্ছা করলে তাকে স্ত্রী হিসাবেও গ্রহণ করতে পারতো।[২০]

জাহিলী যুগে নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়।[২১] লোকজন তাদের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো। কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তাদের অবস্থা কীরূপ হতো সে প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

"তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তাদের মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানিহেতু সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কতো নিকৃষ্ট"! [২২]

কন্যা সন্তানের ব্যাপারে তদানীন্তন আরবদের মনোভাব ছিল অত্যন্ত জঘন্য। তারা কন্যা সন্তানকে পরিবারের জন্য বোঝা মনে করতো এবং তাকে মেরে ফেলাই শ্রেয় মনে করতো অথচ মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

---

[১৮]. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ. ২১

[১৯]. *দ্য এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা*, ১১ সংস্করণ, ১৯১১, খ.২৮, পৃ. ৭৮২

[২০]. ড. মুস্তফা আস-সাবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, বাংলা অনু. আকরাম ফারুক, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮, পৃ. ১৬

[২১]. সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*, কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৫, পৃ. ৩২২

[২২]. আল-কুরআন, ১৬ : ৫৮-৫৯

وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيْرًا

“তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করবে না। তাদের আমিই রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা মহাপাপ।”[২৩]

এক কথায় বলা যায়, নারীদের জীবন রক্ষাই যে সমাজে অসম্ভব ছিল সেখানে সম্পদ লাভের বিষয়টি ছিল একান্ত ভাবে অচিন্তনীয়।

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় নারীর সম্পদ লাভের ক্ষেত্রসমূহ

যারা নারী অধিকার আদায়ে অত্যন্ত সোচ্চার বলে নিজেদের জাহির করেন, তাদের দ্বারা নারী অধিকার অতীতে যেমন ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং বর্তমানেও তাদের দ্বারা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে ইসলামই নারী অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। কুরআন মাজীদের সূরা নিসা'র ৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ৩৩ ও ১৭৬ আয়াতে সম্পদে নারী অধিকারের বিধান বর্ণিত হয়েছে।

কুরআন মাজীদে ঘোষিত মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকার অর্জনকারীদের অংশ গুলো হলো : $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৮}$, $\frac{২}{৩}$, $\frac{১}{৩}$ এবং $\frac{১}{৬}$। এই ছয় প্রকার অংশের জন্য কুরআন মাজীদে মৃতের স্বত্ব অর্জনকারীদের সংখ্যা নারী-পুরুষ মিলে ১২ জন বলা হয়েছে। এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৪ এবং নারীর সংখ্যা ৮ জন। ৪ জন পুরুষ হলেন- (১) পিতা, (২) দাদা, (৩) বৈপিত্রেয় ভাই ও (৪) স্বামী আর মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদে অংশপ্রাপ্ত ৮ জন নারী হলেন -

১. স্ত্রী, ২. কন্যা, ৩. পুত্রের কন্যা, ৪. মাতা, ৫. সহোদর বোন, ৬. বৈমাত্রেয় বোন, ৭. বৈপিত্রেয় বোন ও ৮. দাদী/নানী। তবে অত্র প্রবন্ধে কেবল সম্পদে নারীর অধিকার বিষয়ে আলোচনা সীমিত থাকবে।

অবস্থাভেদে (১) স্ত্রী মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদে $\frac{১}{৪}$ বা $\frac{১}{৮}$ অংশ, (২) কন্যা $\frac{১}{২}$ বা $\frac{২}{৩}$ এবং কন্যার সাথে পুত্র একত্র হলে “নারীর দ্বিগুণ অংশ পুরুষের” (২ঃ১ আনুপাতিক হারে), (৩) কন্যা সন্তানের অবর্তমানে পুত্রের কন্যা বর্তমান থাকা অবস্থায় $\frac{১}{২}$ বা $\frac{২}{৩}$, তবে মৃতের একটি কন্যা থাকলে সে $\frac{১}{২}$ এবং পৌত্রীগণ $\frac{১}{৬}$, (৪) মাতা $\frac{১}{৬}$ বা $\frac{১}{৩}$, (৫) সহোদর বোন $\frac{১}{২}$ বা $\frac{২}{৩}$, (৬) বৈপিত্রেয় বোন $\frac{১}{৬}$ বা $\frac{১}{৩}$, (৭) বৈমাত্রেয় বোন $\frac{১}{২}$ বা $\frac{২}{৩}$ ও (৮) দাদী/নানী $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে।

ব্যবসায়িক সম্পদে নারীর অধিকার

ইসলাম নারীর পরিচালনাধীন ব্যবসায়িক সম্পদে তার অধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। নারী তার এ অধিকার থেকে অতীতে যেমন বঞ্চিত ছিল তদ্রূপ বর্তমান শতাব্দীতেও যে পুরোপুরি অধিকার লাভ করেছে তা বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ

---

[২৩]. আল-কুরআন, ১৭ : ৩১

বলা যায়, ১৯৩৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত ফরাসী আইন অনুযায়ী নারীদের কোন প্রকার চুক্তি স্বাক্ষর করার অধিকার ছিল না। এমনকি একজন বিবাহিত নারীকে তার নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করার জন্যও তার স্বামীর অনুমতি নিতে হতো।[২৪]

ইসলামী আইনের আওতায় নারী যে কোন ধরনের বৈধ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে, তবে চুক্তি স্বাক্ষর করার যাবতীয় শর্ত তার মাঝে বিদ্যমান থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ দু'জন বালেগ ও বুদ্ধিমান নারী-পুরুষ দু'জন বালেগ ও বুদ্ধিমান সাক্ষীর উপস্থিতিতে সহজেই বিবাহ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে। চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ

"সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাযী তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, যদি দু'জন পুরুষ সাক্ষী না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রী লোক; স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে। সাক্ষীদেরকে যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে। বিষয় ছোট হোক কি বড়, মেয়াদসহ লিখতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হবে না। আল্লাহর নিকট এ হচ্ছে ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর"।[২৫]

বর্ণিত আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কেউ বৈধ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে।

বিশেষত ইসলামী আইনে একজন নারীর নিজের ব্যবসায়িক সম্পদ, জমি-জমা এবং অন্যান্য সম্পদে অধিকার স্বীকৃত। একজন নারী তার বিবাহ-পূর্ব কিংবা বিবাহ-পরবর্তী জীবনে যে সম্পদ লাভ করবে তার উপর তার নিরংকুশ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কুরআন মাজীদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

"পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ"।[২৬]

মহানবী স.-এর যুগেও বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা সাহাবী ব্যবসায়িক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। উম্মুল মুমিনীন খাদীজা রা.-এর ব্যবসা বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক প্রসার লাভ

---

[২৪]. ড. মুস্তফা আস-সাবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

[২৫]. আল-কুরআন, ২ : ২৮২

[২৬]. আল-কুরআন, ৪ : ৩২

করেছিল। উম্মে আনমার, আসমা বিনতে মাখরামা, খাওলা, মুলায়কা রা. প্রমুখ আতরের ব্যবসা করতেন।[২৭]

এতদ্ব্যতীত বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা সাহাবী হস্তশিল্প কর্মেও যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। উম্মুল মুমিনীন সাওদা রা. চামড়া প্রক্রিয়াজাত করতেন।[২৮]

চাকুরীর মাধ্যমে অর্জিত সম্পদে নারীর অধিকার

মূলনীতি হলো, "ক্ষেত্র বিশেষে কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত সাধারণভাবে যে কাজ বা পেশা পুরুষের জন্য বৈধ তা নারীর জন্যও বৈধ"। ইসলামের নীতিমালা ও নৈতিকতার সাথে সংগতি রেখে মহিলারা তাদের জন্য সহজসাধ্য যে কোন চাকুরী বা পেশায় নিয়োজিত হতে পারে। সহজসাধ্য পেশার কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, ইসলাম নারীদেরকে কঠোর শ্রমসাধ্য কাজ যেমন- খনির অভ্যন্তরে, লৌহজাত দ্রব্যাদি নির্মাণ কারখানায় ইত্যাদিতে নিয়োজিত হওয়া সমর্থন করে না। তাদের জন্য শিক্ষকতা, ডাক্তারী, সেবাধর্মী কার্যক্রম ইত্যাদিতে নিয়োজিত হওয়া পছন্দনীয়। সে তার শালীনতা, মর্যাদাবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এসব কাজ করতে পারে।

ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র.-এর মতে, নারী শ্রম-বিনিয়োগের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে।[২৯] এ অভিমত থেকে নারীর চাকুরীতে নিয়োগের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। ইসলাম নারীকে মসজিদ, বাজার ও হজ্জে যাবার অনুমতি দিয়েছে। তবে স্বামীর ঘরে অর্থ যোগানদানে সে বাধ্য নয়, পরিবারে তার অর্থ ব্যয় হবে স্বামীর প্রতি অপূর্ব প্রীতির দৃষ্টান্ত।[৩০]

কোন অবিবাহিত নারী যদি কোন পেশা অবলম্বনের মাধ্যমে সম্পদের মালিক হয়, তবুও বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত পিতা তার কন্যার ভরণ- পোষণের দায়িত্ব পালন করবে।[৩১]

আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত এক হাদীসে আছে, তার খালা এবং রসূলুল্লাহ স.-এর এক মহিলা সাহাবী তার ইদ্দাত চলাকালে তার খেজুর বাগান থেকে খেজুর কেটে সংগ্রহ করার জন্য নবী স.-এর নিকট অনুমতি চাইলে তিনি বললেন: "বের হয়ে বাগানে যাও, তোমার খেজুর কাটো। এর বিক্রিত অর্থ হয়ত তুমি দান-খয়রাত করবে অথবা অন্য কোন ভাল কাজে ব্যয় করবে"।[৩২]

---

[২৭]. ইবনুল আসীর, *উসদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা*, আল-কাহেরা : আল-মাকতাবা আত-তাওফিকিয়্যা, তা. বি., খ. ৫, পৃ. ৪৪

[২৮]. প্রাগুক্ত

[২৯]. আল-কাসানী, *বাদাইউস সানাই ফী তারতীবিশ শারাই*, বৈরূত: দারু ইহয়াউত তুরাস আল-আরাবী, ১৪১৯/১৯৯৮, খ. ৪, পৃ. ৪৯৭-৯৮

[৩০]. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪-৩৪৫

[৩১]. ইবনে আবেদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, বৈরূত: তা: বি:, খ. ২, পৃ. ৫৭১

[৩২]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়: আত-তালাক, অনুচ্ছেদ: জিওয়াজু খুরুজিল মু'তাদ্দাতিল বায়িন, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৩৩

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা.-এর স্ত্রী যয়নব-এর কুটির শিল্প ছিল। তিনি তার উপার্জিত অর্থ দিয়ে স্বামী ও সন্তানদের ব্যয় নির্বাহ করতেন। তিনি নবী স.-এর নিকট গিয়ে জানালেন, "আমি একজন কারিগর। আমি তৈরি করা দ্রব্য বিক্রয় করি। এছাড়া আমার স্বামী একজন অসচ্ছল লোক। তাঁর সন্তানের জীবিকার অন্য কোন ব্যবস্থাও নেই। তিনি জানতে চাইলেন, তিনি কি তার উপার্জিত অর্থ এ পথে ব্যয় করতে পারবেন? নবী স. বললেন: হাঁ, তুমি তাদের জন্য ব্যয় করো এবং এজন্য তুমি দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে"।[৩৩]

কর্মক্ষেত্রে নারী তথা নারীর ঘরের বাইরে যাওয়া এবং চাকুরীতে যোগদান নিষিদ্ধ নয় বরং এজন্য অনুমতি রয়েছে। মহানবী স. বলেছেন: "(হে নারী সমাজ!) আল্লাহ্ প্রয়োজনে তোমাদেরকে ঘরের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন"। [৩৪]

পুরুষের ন্যায় নারীরও দুনিয়ার সুখ-দুঃখে অংশীদার হওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। ইসলাম নারীকে হালালভাবে অর্থ উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। যেমন মহিলা সাহাবী আসমা বিনতে মাখরামা রা. আতর ব্যবসায়ী ছিলেন এবং[৩৫] খাওলা বিনতে সা'লাবা রা. তাঁর স্বামীর সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতেন।[৩৬]

উপরোক্ত তথ্যাবলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিটি কর্মক্ষম নারীর ঘরের বাইরে গিয়ে শালীনতা ও পর্দা সহকারে ইসলাম সমর্থিত উপায়ে অর্থ উপার্জনের বিষয় ইসলাম অনুমোদন দিয়েছে।

ওসিয়াত

যারা শরীয়া আইনে মীরাসের অধিকার লাভ করে না বা বিশেষ কারণে মীরাস থেকে বঞ্চিত হয় তাদের ব্যাপারে ইসলাম সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করার বিধান রেখেছে। বর্ণিত আছে যে, সা'দ রা. রোগাক্রান্ত হলে রসূলুল্লাহ্ স.-কে বলেন: "আমার অনেক সম্পদ রয়েছে অথচ আমার একটি মাত্র কন্যা সন্তান। আমি কি আমার সমুদয় সম্পদ মানব সেবায় ওসিয়াত করতে পারি? তিনি বললেন: না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, দুই-তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন : না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তবে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন: হাঁ, তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক।

---

[৩৩]. ইবনে সাদ, *আত-তাবাকাত*, বৈরূত: দারু সাদির, ১৩৭৬/১৯৫৫, খ. ৮, পৃ. ২১২

[৩৪]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আত-তাফসীর, অনুচ্ছেদ: কাওলুহু লা তাদখুলু বুয়ুতান নাবিয়্যি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০, পৃ. ৪০৭

[৩৫]. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, বাংলা অনু. মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ১২৫

[৩৬]. ইবনে হাজার আল-আসকালানী, *আল-ইসাবা ফী তাময়িযিস সাহাবা*, আল-কাহেরা: তা. বি., খ. ৪, পৃ. ৩১০

তোমার সন্তানকে দরিদ্র অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে সম্পদশালী রেখে যাওয়া অধিক উত্তম, যাতে তারা অপরের নিকট হাত পাততে বাধ্য না হয়"।[৩৭]
এ ওসিয়াত পুরুষের জন্য যেমন করা যায় তদ্রূপ করা যায় নারীর ক্ষেত্রেও। অন্যভাবে বলা যায়, এ ওসিয়াত একজন পুরুষ যেভাবে করতে পারে, তদ্রূপ একজন নারীও তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করতে পারে।

স্বামীর সম্পদ বনাম স্ত্রীর সম্পদ

নারী প্রয়োজনে স্বামীর ধন-সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে এবং দান-খয়রাতও করতে পারবে, তবে সে ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা করবে না। কেননা হাদীসে আছে, "স্ত্রী যদি তার স্বামীর উপার্জিত সম্পদ থেকে ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা ব্যতীত কিছু ব্যয় করে তবে সে স্বামীর অনুরূপ সওয়াব পাবে।"[৩৮]

মুযার গোত্রের এক বয়স্কা মহিলা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহর নবী! আমরা তো আমাদের পিতা, পুত্র ও স্বামীদের উপর বোঝা স্বরূপ। এমতাবস্থায় তাদের ধন-সম্পদে আমাদের কী পরিমাণ অধিকার আছে? তিনি বললেন: "স্বাভাবিক ভাবে তোমরা যা খাবে এবং যা দান-খয়রাত করবে"।[৩৯]

মহানবী স. বলেছেন: "একটি দীনার যা তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ, একটি দীনার যা তুমি কোন দাস মুক্তির জন্য ব্যয় করেছ, একটি দীনার যা তুমি কোন দরিদ্রকে দান করেছ এবং একটি দীনার যা তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করেছ -এ সবের মধ্যে তুমি সবচেয়ে বেশি সওয়াব পাবে সেই দীনারের জন্য যা তুমি নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করেছ"।[৪০]

ইমাম আশ-শাওকানী র. বলেন, এ সকল হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীদের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের পিতা, পুত্র ও স্বামীর ধন-সম্পদ তাদের অনুমতি ব্যতীতও পানাহার ও উপহার-উপঢৌকন দেয়া জায়েয।[৪১]

---

[৩৭]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায়: আল-ওয়াসাআ, অনুচ্ছেদ: আল-ওয়াসিয়্যাতু বিস-সুলুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

[৩৮]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায়: আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ: আজরুল খাযিনিল আমীন ওয়াল মারআতি ইযা তাসাদ্দাকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৯

[৩৯]. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায়: আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ: আল-মার'আতু তাতাসাদ্দাকা মিন বাইতি যাওজিহা, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০, পৃ. ১৩৪৮

[৪০]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায়: আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ: ফাযলুন-নাফকাতি আলাল ইআল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৫

[৪১]. ইমাম আশ-শাওকানী, *নাইলুল আওতার,* বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৪০৪/১৯৮৩, খ. ৬, পৃ. ১২৬

দেনমোহর

একজন নারী মীরাস স্বত্ব ছাড়াও দেনমোহর বাবদ বিরাট অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করে থাকে। উল্লেখ্য যে, জাহিলী যুগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারীদের দেনমোহর আদায়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কখনো দেনমোহর আদায় করা হলে তা সবই নারীর পিতা কিংবা অপরাপর পুরুষ অভিভাবক লুটেপুটে খেয়ে ফেলতো। পক্ষান্তরে নারী তার দেনমোহর হতে বঞ্চিতই থেকে যেতো। কখনো বিবাহোত্তর স্বামীও স্ত্রীর সম্পদ হাতিয়ে নিতো। পক্ষান্তরে ইসলাম স্বামীর পক্ষ থেকে তার স্ত্রীকে দেনমোহর প্রদান বাধ্যতামূলক করেছে এবং দেনমোহরের উপর স্ত্রীর নিরংকুশ অধিকারের কথাও ঘোষণা করেছে। কাজেই স্ত্রী তার দেনমোহর লাভ করে স্বাধীনভাবে তা ব্যয় করতে পারবে। এতে তার অভিভাবক কিংবা স্বামী বা অন্য কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। স্বামীর উপর স্ত্রীর দেনমোহর আদায়ের অপরিহার্যতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"তাদের মধ্যে যাদের তোমরা সম্ভোগ করেছ তাদের নির্ধারিত দেনমোহর প্রদান করবে"। [৪২]

অপর এক আয়াতে উল্লেখ আছে: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا

"তাদের (স্ত্রী) একজনকে যদি অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা হতে কিছুই প্রতিগ্রহণ করবে না"। [৪৩]

অন্য এক আয়াতে উল্লেখ আছে : وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা প্রদান করেছ তন্মধ্য থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়"। [৪৪]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"সন্তুষ্ট চিত্তে তারা মোহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে"। [৪৫]

মহানবী স. বলেছেন: "বিবাহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপালনযোগ্য শর্ত হলো, তোমরা দেনমোহর আদায় করবে। কেননা এর দ্বারাই তোমরা দাম্পত্য অধিকার লাভ করে থাক"। [৪৬]

---

[৪২]. আল-কুরআন, ৪ : ২৪

[৪৩]. আল-কুরআন, ৪ : ২০

[৪৪]. আল-কুরআন, ২ : ২২৯

[৪৫]. আল-কুরআন, ৪ : ৪

[৪৬]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায়: আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ: আশ-শুরুত ফিন-নিকাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫-৫৬

অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে: "যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট দেনমোহর ধার্য পূর্বক কোন নারীকে বিবাহ করে অথচ আল্লাহ জানেন যে, সে প্রকৃতপক্ষে দেনমোহর আদায় করবে না, এমতাবস্থায় সে আল্লাহর সাথে প্রতারণা করলো, তার স্ত্রীকে হালাল করার চুক্তি বাতিল করলো এবং সে কিয়ামতের দিন একজন ব্যভিচারী হিসাবে উপস্থিত হবে"।[৪৭]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষের উপর তার স্ত্রীর দেনমোহর আদায় করা অবশ্য কর্তব্য।

মীরাসী আইনের গুরুত্ব

ইসলামে মীরাসী আইনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ আইন যেমন দুনিয়ায় অর্থনৈতিক মুক্তির পথ সুগম করে অপরদিকে আখিরাতের সাফল্যও নিশ্চিত করে। মহান আল্লাহ বলেন:

تِلْكَ حُدُودُ اللّه وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"এগুলো হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটাই মহাসাফল্য। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করলে তিনি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, যেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি "।[৪৮]

মহানবী স. বলেছেন, "তোমরা নিজেরা ফারায়েয (উত্তরাধিকার আইন) শিক্ষা করো এবং লোকজনকে তা শিক্ষা দাও। কেননা এটা (ইসলাম সম্পর্কীয় যাবতীয়) জ্ঞানের অর্ধেক"।[৪৯] সুতরাং বলা যায়, ইসলামী জীবন দর্শনে মীরাসী আইনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

মীরাসী আইন সম্পর্কে বিভ্রান্তির অপনোদন

ইসলামী জীবন বিধানে মীরাস বন্টনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার নিকটতম সম্পর্ক যেমন একটি স্থায়ী মূলনীতি, তেমনি নারীর তুলনায় পুরুষের দ্বিগুণ অংশ প্রাপ্তিও একটি স্থায়ী মূলনীতি। মহান আল্লাহ বাণী : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "এক পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান"।[৫০]

এ বিষয়ে একদল অমুসলিম এবং কিছু সংখ্যক ইসলাম বিদ্বেষী লোক ঘোর আপত্তি জানায় এবং ইসলাম নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে বলে অপবাদ উত্থাপন করে। কাজেই এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। আশা করা

---

৪৭. আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়াইদ ও মাম্বাউল ফাওয়াইদ*, অধ্যায়: আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ: ফী মান নাওয়া আ-ল্লা ইউয়াদ্দি সিদাকা ইমরাআতাহু, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮৪

৪৮. আল-কুরআন, ৪ : ১৩-১৪

৪৯. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-ফারাইয, অনুচ্ছেদ: মা জাআ ফী তা'লীমিল ফারাইয, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০, পৃ. ১৮৬০

৫০. আল-কুরআন, ৪ : ১১

যায়, এর ফলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ইসলাম বিদ্বেষীদের প্রতারণা থেকে নিজেদের রক্ষায় সক্ষম হবে। মুসলিম পণ্ডিতগণ বিষয়টির একাধিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১. মূলনীতি হচ্ছে, "প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্তি তার দায়িত্বের অনুপাতেই নির্ধারিত হয়"। একজন পুরুষের উপর যে ধরনের আর্থিক দায়িত্ব ন্যস্ত, সে তুলনায় একজন নারীর দায়িত্ব অনেক কম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারী সম্পূর্ণ রূপে আর্থিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকে। কেননা পুরুষ নারীকে দেনমোহর, বাসস্থান, ভরণ-পোষণ ইত্যাদি প্রদানে বাধ্য থাকে। পক্ষান্তরে স্ত্রীর উপর উপরোক্ত কোন দায়িত্বই বর্তায় না। কুরআন মাজীদে আছে :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তা এজন্য যে, পুরুষ তাদের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে"।[৫১]

২. স্ত্রীর সার্বিক দাবি পূরণের সাথে সাথে স্বামী তার সন্তান-সন্ততি এবং সংসারের অন্যান্য সদস্যের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতে বাধ্য। মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের (সন্তান-সন্ততির) ভরণ- পোষণ করা"।[৫২]

নারীকে সকল প্রকার আর্থিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েও কেবল মীরাসের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় অর্ধেক সম্পদ দিয়ে ইসলাম যে কত বড় উদারতা প্রদর্শন করেছে বিশ্ব ইতিহাসে তার নজীর নেই। উল্লেখ্য যে, সন্তান-সন্ততি এবং পরিবারের অপরাপর সদস্যদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষকেই বহন করতে হয়, নারীকে নয়- তিনি মা, স্ত্রী, বোন, কন্যা যে পর্যায়ের নারীই হোন। কাজেই নারীর তুলনায় পুরুষের দ্বিগুণ মীরাসী সম্পদ পাওয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত।

৩. স্ত্রী তার স্বামীর নিকট থেকে দেনমোহর পেয়ে থাকে। পক্ষান্তরে পুরুষকে দেনমোহর পরিশোধ করতে হয় এবং এটা স্বামীর উপর ফরয। হিসাব করলে দেখা যায়, নারী পুরুষের তুলনায় কম তো নয়ই, বরং সর্বসাকুল্যে স্বামী অপেক্ষা অধিক সম্পদ লাভ করে থাকে। কাজেই আপত্তিকারীদের অভিযোগ মোটেও সঠিক নয়, বরং কখনো তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত আবার কখনো অজ্ঞতার ফসলও।

৪. মেয়ে তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তার ভাইয়ের তুলনায় অর্ধেক পেলেও দাদা, স্বামী ও বৈপিত্রেয় ভাই থেকে সম্পদ লাভ করে থাকে যা একত্র করলে ভাইয়ের তুলনায় অনেক বেশি হয়। কাজেই ইসলাম নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে -এ অভিযোগ সর্বৈব অপপ্রচার। আমরা নির্দ্ধিধায় বলতে পারি, দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত না করে উত্তরাধিকারে সমতা দাবি করা

---

[৫১]. আল-কুরআন, ৪ : ৩৪

[৫২]. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩

অযৌক্তিক। এটি একটি সুস্পষ্ট পরিপূরক দর্শন। এটিকে আংশিকভাবে বর্জন বা গ্রহণের অবকাশ নেই। কেননা কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে-

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ

"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করো? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা-অপমান এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে।"[৫৩]

কুরআন মাজীদের অপর এক আয়াতে উল্লেখ আছে:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে"।[৫৪]

৫. বিবাহের পূর্বে নারীর ভরণ-পোষণ ও লেখাপড়াসহ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব তার পিতা বা অভিভাবকের উপর অর্পিত হয় এবং বিবাহের পর এ দায়িত্ব বর্তায় তার স্বামীর উপর। উপরন্তু বিবাহের পর স্ত্রী তার স্বামীর নিকট থেকে দেনমোহর লাভ করে থাকে, যা পুরুষ লাভ করে না।[৫৫] কাজেই যারা বলে, মীরাসী স্বত্বে নারীকে ঠকানো হয়েছে এটা তাদের অজ্ঞতারই প্রমাণ।

৬. কন্যাকে অতিরিক্ত কিছু দেয়া যাবেনা বিষয়টি তেমন নয়। কারো পুত্র কিংবা কন্যা সন্তানের কেউ যদি অসচ্ছল হয় এবং পিতা যদি আলোচনার মাধ্যমে পুত্র কিংবা কন্যাকে তার প্রাপ্য অংশ ছাড়াও আরো অতিরিক্ত কিছু দিতে চান তবে তা করতে পারেন অথবা ভাই-বোনেরাও আলোচনার মাধ্যমে সম্পদ বেশি-কম নিতে পারে, ইসলাম এহেন পদ্ধতিকে অস্বীকার করে না। কাজেই পুত্র কিংবা কন্যার প্রাপ্য সম্পদের বেশি-কম নিয়ে প্রশ্ন তোলা নি:সন্দেহে অবান্তর। কুরআন মাজীদে সমঝোতাকে প্রশংসনীয় বলা হয়েছে : "আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়"।[৫৬]

---

[৫৩]. আল-কুরআন, ২ : ৮৫

[৫৪]. আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৬

[৫৫]. মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১, পৃ. ৯৭

[৫৬]. আল-কুরআন, ৪ ঃ ১২৮

৭. ওয়ারিসী সম্পদে নারী-পুরুষের অংশের তারতম্য তাদের মর্যাদার তারতম্য নির্দেশ করে না, বরং মর্যাদার দিক থেকে নারী-পুরুষ উভয় সমান এবং তা কাজের বিচারে নিরূপিত হবে। কেননা কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে:

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"প্রত্যেকের মর্যাদা তার আমল অনুযায়ী। আর তা এজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের আমলের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।"[৫৭]

অপর এক আয়াতে উল্লেখ আছে:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"অবশ্য মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌন অংগ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অংগ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী-এদের জন্য আল্লাহ্ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান"।[৫৮]

মোটকথা, অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বের কারণে একমাত্র মীরাস স্বত্বে নারী-পুরুষের সম্পদ প্রাপ্তিতে কম-বেশি করা হয়েছে। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইসলাম সকল ক্ষেত্রে নারীর ন্যায্য অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে।

৮. ওয়ারিসী সম্পদে নারী-পুরুষের প্রাপ্য অংশে কম-বেশি নির্ধারণ করার সুপ্ত রহস্য একমাত্র মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাত। তাই তিনি বলেছেন:

لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا

"তোমাদের পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা অবগত নও। এসব অংশ আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"।[৫৯]

এ আয়াত নাযিল করে অনাগতকালের ইসলাম বিদ্বেষী এবং ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের উহ্য প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে।

---

৫৭. আল-কুরআন, ৪৬ : ১৯

৫৮. আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৫

৫৯. আল-কুরআন, ৪ : ১১

উপসংহার

মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ হওয়ায় কখনো অজ্ঞতা বশত আবার কখনো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ইসলামের কিছু কিছু বিষয় নিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ায় এবং সমাজের কিছু সংখ্যক লোককে ইসলাম বিদ্বেষী হতে উসকে দেয়। এমন একটি বিষয় হচ্ছে 'সম্পদে নারীর অধিকার', বিশেষত কুরআনের বাণী : 'এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান' (সূরা নিসা : ১১) নিয়ে। অথচ একজন নারী সকল প্রকার অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত থেকে যে কী পরিমাণ সম্পদ লাভ করে তা অভিযোগকারীগণ খতিয়ে দেখতে পারেন। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের লোকদের নারী অধিকারের ব্যাপারে মুসলমানদের সবক দেয়ার কি নৈতিক অধিকার আছে? তারা নিজেদের ইতিহাসের দিকে তাকালেই তো তাদের কুৎসিত চেহারা বিবেকের আয়নায় দেখতে পাবে। আর কোন মুসলিম কি ছেলেমেয়ের সম্পদের বৈষম্য বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন? তার কি জানা থাকার কথা নয় যে, নারী অর্থনৈতিক দায়মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বেশ কিছু জায়গা থেকে সম্পদ পাওয়ায় সে পুরুষের চেয়ে বেশি সম্পদ লাভ করে থাকে। কোন মুসলিম দাবিদার ব্যক্তি এরূপ মন্তব্য করলে তার ঈমান কি প্রশ্নবিদ্ধ হয় না? নিপীড়ন-নির্যাতনের মূলোৎপাটন, দেশে-বিদেশে অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারী সমাজের উন্নয়ন নিশ্চিত করার মহান ব্রত নিয়ে অনেক সংগঠন ও সংস্থা গড়ে উঠেছে এবং অদ্যাবধি তাদের প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। জাতিসংঘ ৮ মার্চ নারী দিবস ঘোষণা করেছে, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সফলতা তো আসেইনি, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্ভোগ আরো বেড়েছে। প্রকৃত পক্ষে মানব চিন্তা যতই শাণিত যুক্তির কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ মনে হোক না কেন, আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল জ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত জীবনের কোন ক্ষেত্রে প্রকৃত সফলতা অর্জন কখনো সম্ভব নয়। কাজেই আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, সম্পদে নারীর অধিকারসহ নারী সমাজের সকল প্রকার অধিকারের একমাত্র নিশ্চয়তা প্রদান করেছে ইসলাম। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধানেও সম্পদে নারী অধিকারের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। কাজেই আল্লাহ প্রদত্ত ও মহানবী স. প্রদর্শিত বিধান যদি বাস্তব জীবনে মেনে চলা যায় তাহলে নারী অধিকারসহ মানবজাতির সর্ববিধ ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। নতুবা মানবীয় প্রচেষ্টা মরীচিকার ন্যায় নিষ্ফল ও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮ সংখ্যা-৩২
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১২

দুর্নীতি দমন : ইসলামী আইনের ভূমিকা

মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম*

[**সারসংক্ষেপ :** *দুর্নীতি একটি বহুল আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর উন্নয়নশীল অনেক দেশেই এটি মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। শক্তির অপব্যবহার এবং অপরাধের শিকড় হচ্ছে দুর্নীতি। দুর্নীতির কারণে বাড়ছে মানসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। আর এ কারণেই স্বচ্ছতা, আল্লাহভীতি ও জবাবদিহিতামূলক সংস্কৃতি গড়ে ওঠছে না। সৃষ্টির আদিকাল থেকে দুর্নীতি বন্ধের জন্য নানা কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু কার্যত কোন কৌশলই ফলপ্রসূ হয়নি। বাংলাদেশে দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনসহ আরো বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আশানুরূপ ফল অর্জিত হয়নি। তবে কিভাবে সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করা যাবে সেটা এখন বিশ্বব্যাপী একটি জিজ্ঞাসা। এ লক্ষ্যে আলোচ্য প্রবন্ধে দুর্নীতির পরিচয়, উৎপত্তি ও বিস্তার, পরিধি, উৎস, কারণ, দমন করার উপায় ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম কি ধরনের বিধান প্রণয়ন করেছে, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।*]

দুর্নীতির পরিচয়

দুর্নীতি কী? প্রথমেই আমাদেরকে এ বিষয়ে জানার চেষ্টা করতে হবে। দুর্নীতি একটি নেতিবাচক শব্দ। সহজ ভাষায় বুঝি কু-নীতি, কু-রীতি। নীতি বহির্ভূত কর্মকাণ্ড।[১] আরবী ভাষায় একে ফাসাদ বলা হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, "যে সব লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি হচ্ছে : তাদেরকে হত্যা করতে হবে কিংবা শূলিবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের নির্বাসিত করা হবে।"[২] আরবী জারীমা শব্দকেও এর সমার্থক শব্দ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। জারীমা অর্থ অপরাধ, পাপ বা আইন বিরোধী কাজ। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো crime, offense তাছাড়া Moral degeneration; a malpractice, a corruption, perversion (বদমায়িশি), wickedness, Improbity, dishonesty (অসততা), a diversion

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

১. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৭, পৃ. ৩৩৯

২. আল-কুরআন, ৫ : ৩৩ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

from the true path (সৎ পথ থেকে বিপথে গমন)।[৩] যার বিপরীত হলো Moral, Morality or relating to the conduct of men; The doctrine or practice of the duties of life.[৪]

- Oxford English Dictionary তে বলা হয়েছে, Dishonest, illegal behabior, especially of people in authority, elegations of bribery.[৫] অর্থাৎ "দুর্নীতি হল অসততা, অবৈধ আচরণ, বিশেষ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে আসীন ব্যক্তিবর্গের আইন বহির্ভূত আচরণ, ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ ইত্যাদি"।
- দুর্নীতি হলো সমাজে প্রচলিত নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী বিশেষ ধরনের অপরাধমূলক আচরণ।[৬]
- সাধারণত ঘুষ, বলপ্রয়োগ, ভয়-ভীতি প্রদর্শন, প্রভাব খাটিয়ে এবং ব্যক্তি বিশেষকে সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গণপ্রশাসনের ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা অর্জনের নাম দুর্নীতি।[৭]
- রমনাথ শর্মার মতে, In corruption a person willfully neglected his specified duty in order to have an undue advantage.[৮] অর্থাৎ "অবৈধ সুযোগ সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলার নাম দুর্নীতি"।
- World Bank কর্তৃক প্রদত্ত দুর্নীতির সংজ্ঞা হলো : Corruption is the abuse of public power for private benefit.[৯] অর্থাৎ "দুর্নীতি হলো ব্যক্তিগত স্বার্থে সরকারি দায়িত্বের অপব্যবহার।"

---

৩. Samsad Bangali-English Dictionary, Calcatta: Sahitya Samsad, 1988, P.443

৪. Oxford Dictionary, Edited by Oxford University Press. Oxford Learner's Favorite Dictionary' Edited by Prof. Raihan Kawsar & Khairul Alam Monir, Published by Chowdhury & Son's, Dhaka : Banglabazar, 2006.

৫. A.S Hornby, Oxford Advanced Learner's of Current English, Oxford University Press, 2000, p-201

৬ ড. মুহাম্মদ জাকির হোসাইন, *আর্থ সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ.৪০৭

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭-৪০৮

৮. প্রাগুক্ত

৯. Vito Tanzi, "Corruption around the world causes, consequencesscope and cures in *Governance, corruption & economics performance*"

- Trancparency International (TI) Ges Corruption Perception Index (CPI) প্রতিবেদনে দুর্নীতি বলতে সরকারি ক্ষমতা ও সুবিধাকে বেসরকারি বা ব্যক্তি স্বার্থে অপব্যবহার এবং সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদদের দুর্নীতিকে বুঝানো হয়েছে।[১০]
- Trancparency International -এর সংজ্ঞা হলো : Corruption is the abuse of public office for private gain. অর্থাৎ "সরকারি দফতরকে ব্যক্তি স্বার্থে কাজে লাগানো, যেখানে জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়।"[১১]
- M.Johne এর মতে, "Corruption is missuse of public property, public rank and status for private interest."[১২]

দুর্নীতি কেবল সরকারি কার্যক্রমের মধ্যে সীমিত নয়; বরং সরকারি, বেসরকারি, এনজিও বিভিন্ন পেশা, শ্রেণী, পরিবার, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক স্বার্থেও হতে পারে। যেমন, একজন সরকারি কর্মকর্তা অসুস্থতার কথা বলে ছুটি নিয়ে ব্যক্তিগত কার্যাবলী সম্পন্ন করতে পারেন, যা দুর্নীতি হিসেবে বিবেচিত হবে অথবা সরকারি বাজেটের টাকা দিয়ে টেন্ডার ছাড়াই কোন কাজ নিজের বা দলীয় লোকদের মাধ্যমে করানো অথবা টেন্ডার দিলেও কাজের মান যথাযথভাবে ঠিক না রেখে কিছু টাকা খরচ করে বাকি টাকা নিজের পকেটস্থ করাও দুর্নীতি হিসেবে গণ্য হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, দুর্নীতি হলো প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি, আচার-আচরণ, আইনকানুন এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে উদ্ভূত এমন এক পরিস্থিতি যা সঠিকভাবে উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যাহত করে। অন্য কথায় দায়িত্বে অবহেলা, ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ ও উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অবৈধ স্বার্থ হাসিল করাকে দুর্নীতি বলে।

দুর্নীতির উৎপত্তি ও বিস্তার

সভ্যতার প্রথম থেকেই প্রশাসনিক দুর্নীতির প্রচলন কমবেশি বিদ্যমান ছিল। সম্ভবত প্রশাসনের উৎপত্তির সাথে সাথেই এর প্রচলন ও বিস্তার ঘটতে থাকে। এটি মানুষের 'ফিতরাত' তথা স্বভাবের একটি মন্দ দিক। আসমানী কিতাব তাওরাত (Old

---

edited by George T.Abed & Sanjeev Gupta Washingto International monetary Fund, 2002, P.25

১০. আবদুন নূর, *'আদর্শ, উন্নয়ন ও দুর্নীতি: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ'* তা. বি. পৃ. ১৭-১৮

১১. মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন, *দুর্নীতি ও উন্নয়ন : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ*, ঢাকা: মাসিক ইতিহাস অন্বেষা, মার্চ - ২০০৬, পৃ. ৪৩

১২. Political Conference of corruption Comparative Politics, P. 460

Testament) এর বিকৃতি ছিল ইতিহাস বিখ্যাত একটি জঘন্য দুর্নীতি।[১৩] প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে ভারতীয় রাজতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য (Kautilya) তাঁর প্রখ্যাত অর্থশাস্ত্র (Arthashastra) গ্রন্থে দুর্নীতির বিষয়টি আলোকপাত করেছেন।[১৪] প্রায় ৭০০ বছর পূর্বে দান্তে (Dnte) ঘোষণা করেন, আইন বহির্ভূত কর্ম সম্পাদন কিংবা স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কাউকে প্রভাবিত করার জন্য ঘুষ-উৎকোচ প্রদানকারীর অবস্থান হলো নরকের সর্বনিম্ন স্তরে।[১৫] বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক উইলিয়াম শেক্সপিয়র তাঁর কোন একটি নাটকে দুর্নীতিকে বিখ্যাত চরিত্রে রূপায়ন করেছেন।[১৬] আমেরিকার সংবিধানে ঘুষ উৎকোচ এবং প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডকে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যে অপরাধ সম্পাদনের কারণে সেখানকার প্রেসিডেন্ট ইম্পিচম্যান্টের যোগ্য হতে পারেন।[১৭] ১৭৭৫ সালে ভারতবর্ষের ইংরেজ গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিং মীরজাফরের পত্নীকে দেড় লক্ষ টাকা উৎকোচ দেয়ার বিনিময়ে মুর্শিদাবাদে নবাবের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে নিযুক্তি লাভ করেন। অবশ্য এজন্য ব্রিটিশ প্রধানন্ত্রী উইলিয়াম পিট তাঁকে গভর্নরের পদ থেকে ইম্পিচ করেন। সিভিল প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য ভারতের গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিংক ১৮২৮ সালে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সততা যাচাইয়ের জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন (ACR) গ্রহণের নিয়ম প্রচলন করেন।[১৮] ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর ১৯৫৭ সালে এদেশে দুর্নীতি দমন ব্যুরো গঠন করে দুর্নীতি প্রতিরোধের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দাড় করানো হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা সরকার প্রধানের অধীনস্থ দফতরে পরিণত হওয়ায় এ ব্যুরো তার কার্যকারিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। ফলে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর থেকে এ দেশের প্রায় সকল সরকারের ক্ষেত্রেই কম-বেশী দুর্নীতির অভিযোগ উচ্চারিত হয়েছে। প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক দুর্নীতির অভিযোগ কোন নতুন ঘটনা নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক জরিপে বর্তমানে হতাশাব্যঞ্জক চিত্র ফুটে ওঠে। সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কারণে সরকারের প্রতি বছর যে অপচয় হয় তা হচ্ছে ১১,২৫৬ কোটি টাকা।[১৯] ফলে সকল স্তরে উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে এবং উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। পার্শ্ববর্তী দেশ চীন ও ভারতের চেয়ে প্রবৃদ্ধি অনেক কমে যাচ্ছে। ২০১১ সালে GDP তে বিনিয়োগের অবদান মাত্র ৩ দশমিক ২ শতাংশ। ADB-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর তেরেসাখো বলেন, WEF-এর ২০১১-১২

---

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

১৪. Vito Tanzi, "Corruption around the world" P. 25

১৫. আবদুন নূর, প্রাগুক্ত পৃ. ১৯

১৬. প্রাগুক্ত পৃ. ১৯-২০

১৭. Nooman John T, Bribes, New Yourk, 1984

১৮. আবদুন নূর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

১৯. Transparency International, সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর, সেপ্টম্বর ২৩, ২০০২

রিপোর্টে দেখা গেছে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অবকাঠামোর দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে। এর অন্যতম কারণ দুর্নীতি।[২০]

দুর্নীতির পরিধি

আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায়, সারা পৃথিবীকেই দুর্নীতি গ্রাস করে ফেলেছে। কিন্তু নীতি বহির্ভূত সকল প্রকার কাজ-কর্ম, আচার-ব্যবহার ও কথা-বার্তা সবই এর আওতাভুক্ত। যেহেতু আয়-উপার্জন জীবনের বিশাল অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই এ ক্ষেত্রে দুর্নীতিকে যৌক্তিক কারণেই বড় করে দেখা হয়। দুর্নীতি ব্যাপক বিস্তৃত একটি পরিভাষা। নীতি হিসেবে আমরা যদি ইসলামকে বেছে নেই তবে দুর্নীতিরও একটি সংজ্ঞা প্রয়োজন। ইসলামে সংজ্ঞা যদি এই হয়, 'আল্লাহর বিধান ও দীনের সামনে আত্মসমর্পণ' অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা, যদ্বারা আল্লাহ সকল বিধানের পরিপূর্ণতা ঘটিয়েছেন সেগুলো মনে প্রাণে মেনে নেয়া। যিনি মেনে নিবেন তার মধ্যে কতগুলো গুণ-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে, যথা: তিনি নীতিবান হবেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সদা তৎপর থাকবেন, তার মধ্যে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ পাবে ইত্যাদি। বিপরীত দিকে ইসলামী শরীয়তে অপরাধ (জারীমা) বলেও একটি পরিভাষা রয়েছে। দুর্নীতি একটি অপরাধ। যে সম্পর্কে আল্লাহ হদ্দ (বিধিবদ্ধ শাস্তি) অথবা তাজীর (দণ্ডবিধি) দ্বারা হুমকি প্রদান করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিশাপ এবং পরকালে জাহান্নামের শাস্তির হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে।"[২১]

মানুষের ইচ্ছা শক্তির দ্বারা সংঘটিত নৈতিক কর্মসমূহের বিপরীতে দুনিয়া ও পরকালে পুরস্কৃত করা হবে এবং অনৈতিক বা পাপাচারের পরিণামে শাস্তি প্রদান করা হবে। মানুষের ইচ্ছা শক্তি হচ্ছে বিনিময়ের মাপকাঠি। ইচ্ছাশক্তি যখন অপরাধ কাজের অবয়বে প্রকাশিত হয়, তখন সেটাই দুর্নীতি এবং সেটাই দণ্ডযোগ্য। এ অপরাধ মানুষের মধ্যে মন্দ চর্চার দ্বারা বিকশিত হয়। মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা চারটি প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। তা হলো-প্রভুত্বের গুণাবলী, শয়তানী গুণাবলী, পশুত্বের গুণাবলী ও হিংস্রতার গুণাবণী।[২২] প্রভুত্বের গুণাবলী দুশ্চরিত্রের উন্মেষ ঘটায়। যেমন: অহংকার, গর্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রশংসা ও গৌরবের মোহ, বিরোধিতা ও চিরস্থায়ীত্বের মোহ, সবার উপরে বড়ত্বের অনুসন্ধান ইত্যাদি। এগুলো মানব চরিত্র বিধ্বংসী গুণ। এগুলোই দুর্নীতির জন্ম দেয়। শয়তানী গুণাবলী থেকেও অসংখ্য শাখা-প্রশাখা জন্ম

---

[২০]. দৈনিক আমার দেশ, ২৩ মে- ২০১২

[২১]. ড. মোহাম্মদ মোস্তাফা কামাল, *মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন*, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী- ২০০৬

[২১]. প্রাগুক্ত

[২২]. প্রাগুক্ত

নেয়। ইবলিস অহংকার করার কারণে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং ফেরাউন নিজেকে প্রভূ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে অভিশপ্ত হয়েছে। হিংসা, বিরুদ্ধাচরণ, কৌশল, ধোঁকা, বিশৃঙ্খলা নির্দেশ, ষড়যন্ত্রের নির্দেশ, জালিয়াতী, মুনাফেকী, বিদায়া'ত ও গুমরাহীর দিকে দাওয়াত প্রদান এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। আর পশুত্বের গুণাবলী থেকে জন্ম নেয় নোংরামী, কুফ্‌রী, যৌন ও পেটের প্রয়োজন মেটানোর লোভ। যার ফলে যেনা-ব্যভিচার ও সমকামিতা, চুরি, জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ, বাসনার জন্য নেশার যোগান হয়ে থাকে। আর হিংস্রতার গুণাবলী থেকে জন্ম নেয় ক্রোধ-জিঘাংসা, সম্পদ বিনষ্ট, হত্যা, গালমন্দ ও মানুষের ওপর অন্যায় আক্রমণের প্রবণতা।

দুর্নীতির উৎস

মানুষ জন্মগতভাবে দু'টি বিশেষ গুণের অধিকারী। এক. Rationality তথা যুক্তিবোধ: আরবীতে বলা হয় 'নাফ্‌সে মুতমাইন্না' তথা প্রশান্ত হৃদয়, যা বিকশিত করে মানুষ মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধ অর্জন করে নিজেকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা হিসেবে পরিগণিত করতে পারে। দুই. পাশবিকতা: আরবীতে বলা হয় 'নাফ্‌সে আম্মারা' যার প্রাবল্য মানুষকে পশুত্বের নিম্ন পর্যায়ে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "নিঃসন্দেহে আমরা মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমরা তাকে সর্ব নিম্ন স্তরে পৌঁছে দিয়েছি"।[২৩] 'নাফ্‌সে আম্মারা' মানুষকে অন্যায় ও অশুভ কাজে প্রলুব্ধ করে।[২৪] আর এ অশুভ প্রবণতার প্রভাবে মানুষের মধ্যে পশুত্বের (Animility) সৃষ্টি হয়। কারণ মানব প্রবৃত্তি তথা নাফ্‌স অতি সহজেই সংকীর্ণতার দিকে ঝুঁকে পড়ে।[২৫] "আর যে সত্তা অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছে সে সকল ক্ষেত্রে সফলকাম হিসেবে বিবেচিত।[২৬] রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "মানব দেহের অভ্যন্তরে একটি গোশতপিণ্ড রয়েছে, যা ভালো থাকলে পুরো দেহ ভালো থাকে আর তা মন্দ হলে পুরোটাই মন্দ হয়ে পড়ে। আর সেটি হল অন্তর"।[২৭] মানুষের এ অশুভ প্রবণতাকে ইমাম গাযালী র. শয়তানী প্রবণতা হিসেবে অভিহিত করেছেন।[২৮] এ ছাড়া দুর্নীতির উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা যায় পরিবার, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রচার মাধ্যমকেও।

---

২৩. আল-কুরআন, ৯৫ : ৪-৫ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

২৪. আল-কুরআন, ১২ : ৫৩ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

২৫. আল-কুরআন, ৪ : ১২৮ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

২৬. আল-কুরআন, ৫৯ : ৯ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

২৭. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, দেওবন্দ: মাকতাবা মুসতাফাবী ১৪০৭ হি., খ. ১, অধ্যায় : আল-ঈমান, পৃ. ১৩

২৮. আবদুন নূর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

(ক) পরিবার

মানব শিশু জন্ম গ্রহণ করার পর যাদের পরিবেষ্টনে আবদ্ধ থাকে সেটিকে সে শিশুর পরিবেশ বলা হয়। ছোট এ গণ্ডি বা বেষ্টনীর প্রধান দু'জন সদস্য হলো পিতা ও মাতা, যাদেরকে আমরা অভিভাবক বলে থাকি। একটু ব্যাপকাকারে বলতে গেলে এর সাথে দাদা-দাদী, চাচা ও ফুফিকেও সদস্য হিসাবে যোগ করতে পারি। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার পরিবেশেরও সম্প্রসারণ ঘটে। পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে সমাজ ও মনোবিজ্ঞানীগণ ব্যাপক গবেষণা ও আলোচনা করেছেন। পরিবেশ মানব শিশুর বিভিন্নমুখী আচরণ, ব্যবহার ও দোষ-গুণের ওপর কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে। সকল শিশুই ফিতরাত তথা সত্য ও ন্যায়ের যোগ্যতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। যে পরিবেশে বা পরিবারে সে জন্ম গ্রহণ করেছে সেটি যদি তার ফিতরাতের অনুকূল হয়, তবে সে সত্য ও ন্যায়ের উপর টিকে থেকে তার সুকুমার বৃত্তিগুলোকে সুচারু রূপে প্রস্ফুটিত করতে পারে। আর পরিবেশটি যদি বিপরীতমুখী হয় তবে তার চরিত্র বিপরীতমুখী ধাঁচেই গড়ে ওঠে। পারিবারিক পরিবেশ যদি নৈতিক আদর্শ বিবর্জিত হয়, সে পরিবেশের শিশুটি খারাপ চরিত্র ধারণ করে বেড়ে ওঠবে এটিই স্বাভাবিক।

পরিবার হলো একটি শিশুর জীবন গড়ার প্রাথমিক পাঠশালা। এ পাঠশালার পাঠ্য তালিকায় যে ধরনের বই সিলেকশন করা হবে, শিশুর জীবনের ভিত রচিত হবে সে সিলেবাসেরই উপর। এ জন্য পরিবারের শক্তিশালী দু'জন সদস্য পিতা-মাতার গুরুত্ব অপরিসীম। পিতা-মাতা যে ধরনের আচরণ, কথা-বার্তা ও কাজ-কর্ম করেন ছেলে-মেয়ে সে সব অনুসরণ করতে শেখে। শিশুর পিতা-মাতা যদি ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও আল্লাহভীরু হন এবং পারিবারিক পর্যায়ে নৈতিকতার পরিচর্চা করেন, তাহলে তাদের সন্তানও সেভাবেই গড়ে উঠবে। ছেলে-মেয়েদের নৈতিক চরিত্র গঠন করা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা সুস্পষ্ট জুলুম হিসাবে বিবেচিত। আল্লাহ্ বলেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিজেদেরকে ও পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো।"[২৯] রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "সুন্দর নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার চাইতে উত্তম কিছুই মা বাপ সন্তানদের দান করতে পারে না।"[৩০] রসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেন, "কোন সন্তানের সাত বছর বয়স হলেই তাকে নামাযের আদেশ দাও। আর দশ বছর বয়স হলে নামাযের জন্য প্রহার করো ও বিছানা আলাদা করে দাও।"[৩১]

---

[২৯]. আল-কুরআন, ৬৬ : ৬ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

[৩০]. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-বিরর ওয়াল সিলাহ্, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফি আদাবিল ওয়াসাদ, আল-কুতুবস সিত্তাহ্, রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৪২৯/২০০৮, পৃ. ১৮৪৮

[৩১]. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আস-সালাত, অনুচ্ছেদ : মাতা ইউসারুল গুলামু বিস সালাহ্, আল-কুতুবুস সিত্তাহ্, রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০, পৃ. ১২৫৯

পক্ষান্তরে এ দু'জন যদি বিকৃত স্বভাব ও কুরুচিপূর্ণ মনের অধিকারী হন এবং আধুনিক ও প্রগতিবাদী সাজার অভিপ্রায় নিয়ে উচ্ছৃংখল আচার-আচরণ, কথা-বার্তা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিসরে চালু করেন, তবে তাদের পরিবারটি নৈতিকতা বিবর্জিত হবে এটাই স্বাভাবিক। সেখানে শ্রদ্ধাবোধ, লজ্জা-শরম, স্নেহমমতা ও ভালবাসার পরিবর্তে বেয়াদবি, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও উচ্ছৃংখলতা ব্যাপকহারে চালু হবে। আমাদের সমাজে উচ্ছৃংখল কিছু পিতা-মাতা এমনও রয়েছেন যে, নিজেদের কোমলমতি ও নিস্পাপ ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একই সাথে দেশী-বিদেশী টিভি পর্দায় নর্তক-নর্তকীদের উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ নাচ, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও বিকৃত যৌনাচারমূলক দৃশ্য তৃপ্তি সহকারে উপভোগ করেন। একটি শিশু দুশ্চরিত্র হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য যতগুলো উপকরণ প্রয়োজন সবগুলোর যোগান এ পিতা-মাতাই দিয়ে থাকে। আবাদুল্লাহ ইবনে আমির রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। বর্ণনাকারী বলেন, নবী স. অশ্লীলভাষীও ছিলেন না এবং অশ্লীলতার ভানও করতেন না।"[৩২] নবী স. বলেন,"প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বা খৃষ্টান বানায় অথবা অগ্নি-উপাসক বানায়।"[৩৩]

পিতামাতাই যদি নিজ হাতে নিজের সন্তানদেরকে ধ্বংসের পথে তুলে দেন তবে সে সমস্ত পিতা-মাতাকে মূলতঃ দেশ ও জাতির শত্রু বলেই আখ্যায়িত করা যায়। কারণ অপরিণামদর্শী এসব পিতা-মাতাই জাতীয় দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, গডফাদার, আন্তর্জাতিক চোরাচালানী, চোর-ডাকাত বানাবার সবগুলো উপাদান চেতনে বা অবচেতনে পারিবারিক পরিবেশে ছোট কচি মনের শিশুটির জন্য প্রধান যোগানদাতার ভূমিকা পালন করেন। তাই সকল পিতামাতার উচিত নিজের প্রাণপ্রিয় শিশুটিকে সৎ, আল্লাহভীরু ও ইসলামী অনুশাসনের পূর্ণ অনুসারী হিসাবে গড়ে তোলার নিমিত্তে পারিবারিক পরিবেশে আল্লাহ প্রদত্ত ও রসূলুল্লাহ স. প্রদর্শিত পন্থায় সুস্থ বিনোদন ব্যবস্থা চালু করা।

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পরিবারের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো একটি শিশুর জীবন গড়ার দ্বিতীয় প্রধান পাঠশালা। এ পাঠশালার পাঠ্য তালিকাও একটি শিশুর জীবনের ভিত রচনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে জাতিসত্তা ও সভ্যতার

---

[৩২]. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বিরর ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফিল ফুহশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫০

[৩৩]. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-কাদার, অনুচ্ছেদ : মা জাআ কুল্লু মাওলুদিন আলাল-ফিতরাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬৬

অবকাঠামো। জাতীয় চরিত্র গঠন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও বিভাগে নেতৃত্বদানের উপযোগী সৎ নেতৃত্ব গড়ে ওঠে শিক্ষার মাধ্যমে। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় অবাধ ভোগবাদী সিলেবাস চালু আছে, যা আলোকিত লোক তৈরীতে সম্পূর্ণ অক্ষম। বর্তমানে লক্ষ্য করা যায়, দুর্নীতিবাজদের একটা বিরাট অংশ বর্তমান প্রচলিত শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত। যারা কলমের খোঁচায় ও ফাইল আটকিয়ে রেখে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে, অথচ এ শিক্ষাকেই বলা হয় 'শিক্ষাই আলো'। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, এ সমস্ত উচ্চশিক্ষিত লোক কেন আজ অন্ধকার জগতের বাসিন্দা ? প্রকৃতপক্ষে উচ্চশিক্ষিত হওয়া আর সৎ লোক হওয়া এক কথা নয়। সৎ ও আধুনিক যোগ্য লোক গঠনের জন্য অবশ্যই আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। কোন বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত হিসাবে গড়ে তোলার পাশাপাশি অপরাধের প্রতি ঘৃণা এবং অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার মনোভাব সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন, তবে এ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাষ্ট্রকেই পালন করতে হবে।

আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে মানুষ গড়ার কারিগর মুহাম্মদ স. দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত একটি সমাজকে উদ্ধারের নিমিত্তে কী ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন তা লক্ষণীয়। সে শিক্ষা ব্যবস্থার সিলেবাস ছিল -আল-কুরআন ও আল-হাদীস। এ শিক্ষা গ্রহণ করে গড়ে উঠেছিলেন আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রা.-এর মত মানবেতিহাস খ্যাত শাসক ও মনীষী। এ ব্যবস্থা আত্মস্থ করে এমন একদল মানুষ তৈরি হলেন যে, যারা অপরাধের পর বিবেকের কশাঘাতে টিকতে না পেরে নিজেদের অপরাধের বিচার প্রার্থনার জন্য রসূলের বিচারালয়ে হাজির হতেন। নিজে ক্ষুধার্ত থেকে অভুক্তকে নিজের খাদ্য বিলিয়ে দেয়ার মানসিকতা গড়ে ওঠলো। এতে এমন এক দল চরিত্রবান নেতৃত্ব গড়ে ওঠলো, যারা এক সময় মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর জন্য হুমকি ছিল, পরবর্তীতে তাদের পরিচালিত রাষ্ট্রে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে রাতে-দিনে সুন্দরী, মূল্যবান সব অলঙ্কার পরিহিতা মহিলা একাকি পথ চলেছে কিন্তু কেউ তাকে জিজ্ঞাসাও করেনি, কেউ তার দিকে চোখ তুলে দৃষ্টিপাতও করেনি। প্রত্যেকটি মানুষ পরস্পরের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর বিশ্বস্ত আমানতদার বনে গেল। আল-কুরআন এমন সোনার মানুষ তৈরি করল যে, অর্ধেকটা পৃথিবীর বাদশাহী হাতের মুঠোয় পেয়েও দায়িত্বের ভার তাকে এমনভাবে তাড়া করে ফিরতো যে, আরামের ঘুম দূরে ঠেলে দিয়ে রাতের আঁধারে বেরিয়ে পড়লো অভুক্ত মানুষের সন্ধানে। কোথাও কি অসহায় মানবতা জুলুমের শিকার হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করছে ? কেউ কি তাঁর শাসন কাজে অসন্তুষ্ট? এ সমস্ত প্রশ্ন তাকে সদা অস্থির করে তুললো। প্রয়োজন পূরণে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দু'টি কাপড় নয় বরং অন্যান্য

নাগরিকদের ন্যায় একটিই গ্রহণ করলো। কিন্তু এক টুকরা কাপড় দিয়ে তার জামা হওয়ার কথা নয়; ছেলের ভাগের কাপড় দিয়ে নিজের জামা তৈরি করে নিল।

সুতরাং দুর্নীতির সব ব্যবস্থা উন্মুক্ত রেখে দুর্নীতি দমন অসম্ভব। এ জন্য রসূলের স. পন্থায় আলোকিত মানুষ তৈরির জন্য আমাদের সেই কুরআন-যা আজো অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে, সেটিকে আমাদের সকল কাজে মূলনীতি রূপে গ্রহণ করতে হবে।

(গ) প্রচার মাধ্যম

দেশের প্রচার মাধ্যমগুলো দুর্নীতি উচ্ছেদে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকার মিডিয়াগুলোকে নৈতিকতাসম্পন্ন অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য বাধ্য করতে পারে। এতে মিডিয়ার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবে না। কারণ দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য এ ধরনের বাধ্যবাধকতা কারো স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, অধিকাংশ মিডিয়া এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দখলে যারা নীতি-নৈতিকতার ধার ধারে না। যারা অবাধ স্বাধীনতার নাম করে কখনো কখনো সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করতে কসুর করে না। অনেক সময় মনে হয়, এদের কাছে সরকার অসহায়। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। কিছু সংখ্যক মিডিয়া আজ ভয়ঙ্কর স্বেচ্ছাচারিতার রূপ ধারণ করেছে। কখনো কখনো দেশের মানুষের চরিত্র হননের সাথে সাথে সমাজ ভাঙনে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। এমন সব তথ্য প্রচার করে, যা আণবিক বোমার চেয়েও অধিক ক্ষতিকর। বোমা একটা নির্দিষ্ট আওতায় কিছু লোকের জান-মালের ক্ষতি করে থাকে কিন্তু একটি বিকৃত মিথ্যা তথ্য সমাজ ভাঙনের কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে থাকে। ইথারে ভেসে ভেসে তার আওতার বিস্তৃতি ঘটায়। সমাজকে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সামনে এনে দাড় করায়। সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধের স্থান দখল করে নেয় হিংসা-হানাহানি, বিদ্বেষ আর অমানবিকতা। ফলে মানুষ চরম দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হয়। সুতরাং সরকারের দায়িত্ব এ ধরনের স্বেচ্ছাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রচারমাধ্যমকে নৈতিকতা বিকাশে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বাধ্য করা।

৫. দুর্নীতির কারণ

নানা কারণে দুর্নীতি হতে পারে, কোন একক উপাদানকে দুর্নীতির কারণ বলে উল্লেখ করা যায় না। নিম্নে এর কারণগুলো বর্ণনা করা হলো-

ক. ইসলামী মূল্যবোধ ও আখিরাতে জবাবদিহিতার অভাব : মানুষ ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক পরিবেশ থেকে নৈতিক মূল্যবোধের প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। যে জাতি ইসলামী শিক্ষায় তথা ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, যাদের তাকওয়া ও আখিরাতে জবাবদিহিতার বালাই নেই সে সমাজে দুর্নীতি সহজেই প্রবেশ করে। তার সাথে বাড়তে থাকে অনৈতিক কর্ম, দেখা দেয় হানাহানি, মারামারি ইত্যাকার বিষয়।

খ. সামাজিক পরিবর্তন : সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের কারণে সামাজিক মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটছে। সময় সময় সামাজিক অবস্থার প্রচণ্ড পরিবর্তনের চাপে মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তার ভাব জন্মায়। এরূপ অনিশ্চয়তা হতে রক্ষার জন্য মানুষ বৈধ বা অবৈধ যে কোন উপায়েই হোক না কেন টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ অর্জন করতে চায়। ফলে দুর্নীতির জন্ম হয়।

গ. নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শ বিবর্জিত রাজনীতি : অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা জনগণের ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভের পরই নি:সংকোচে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজেরা অবৈধ উপায়ে সুবিধা লাভে লিপ্ত হয় এবং কখনো কখনো একে দূষণীয় মনে না করে যেন অধিকার মনে করে। বিভিন্নপদে স্বজনদেরকে নিয়োগদান, নিজ দলের লোকজনকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধাদান এবং এর মাধমে অযোগ্য ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগদান করে। এভাবে অযোগ্য লোকদের নিয়োগদানের মাধ্যমে দেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে।

ঘ. বৈষয়িক কারণ : উন্নত দেশে ব্যক্তির বৈষয়িক সম্পত্তি এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার উপর সমাজে স্থান ও মর্যাদা নিরূপিত হয়। আমাদের দেশে সম্পদের স্বল্পতা ও অভাবের কারণে সরকার সকল কর্মীকে পর্যাপ্ত ভাতা প্রদান করতে পারে না। ফলে সে সমাজের লোকজন জীবিকা নির্বাহের জন্য এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ বৈষয়িক ব্যাপারটি দুর্নীতির অন্যতম কারণ।

ঙ. অর্থনৈতিক কারণ : দুর্নীতির অন্যতম আরেকটি কারণ হলো অর্থনীতি। অভাবে যখন স্বভাব নষ্ট হয় তখন সে নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে অসৎ পথে আয় করতে চায়। সীমিত আয়, অর্থাভাব, আয়ের তুলনায় বেশি ব্যয়, সন্তানের খরচ যোগানো ইত্যাদি কারণে দুর্নীতি করে থাকে।

চ. প্রকৃত শিক্ষার অভাব : বর্তমান সমাজে এ সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করেছে। প্রতি বছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে তাদের শিক্ষা জীবন শেষ করছে, সার্টিফিকেট নিয়ে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু তারা প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। ফলে তারা যখন বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করে সোনার হরিণ নামক চাকরি পেয়ে যায় আর তারাই আবার দুর্নীতিসহ নানা অপকর্মে অবলীলাক্রমে জড়িয়ে পড়ে।

ছ. বেতন ক্রম ও পদের স্তর : আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বেকার সমস্যা। তারপর ভাগ্যের কিংবা মামার জোরে কোনমতে চাকরি হলেও সরকারি

চাকরিতে সহনীয় উপযুক্ত ও মানসম্মত বেতন স্কেল ও পদোন্নতি তত সহজ নয়। ফলে খুব সহজেই একজন কর্মকর্তা দুর্নীতিতে আকৃষ্ট হয়।[৩৪]

এ ছাড়াও দুর্নীতির পিছনে যে সকল কারণ চিহ্নিত করা যায় তা হলো :

- আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি;
- জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য ও অনুদান বৃদ্ধি এবং তা ব্যয়-বিনিয়োগে তদারকির অভাব;
- আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার;
- আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য এবং শাসকবৃন্দের স্বেচ্ছাচারিতা;
- স্বার্থপরতা ও স্বজনপ্রীতি;
- বিশ্বায়ন (Globalization), বেসরকারীকরণ (Privatization);
- অতি লোভ, উচ্চাভিলাষ, বিলাসিতাপূর্ণ মানসিকতা ও সম্পদ আহরণে অসম অন্যায় ও প্রতারণামূলক প্রতিযোগিতা;
- কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব;
- দ্রব্যমূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বেতন কাঠামো নির্ধারণ না করা;
- মেধা, যোগ্যতা ও কর্মের যথাযথ মূল্যায়নের অভাব;
- সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে বেতন বৈষম্য;
- দুর্নীতিবাজদেরকে সামাজিকভাবে প্রতিরোধের ব্যবস্থা না থাকা এবং তাদেরকে ঘৃণার চোখে না দেখা;
- দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না থাকা;

৬. দুর্নীতি দমন করার উপায়

ইসলামের নিম্নোক্ত টুলসগুলোর বাস্তবায়ন করতে হবে। যেমন-

রোযা : তাকওয়া ভিত্তিক সমাজ গঠনে রোযার গুরুত্ব অপরিসীম। রমযানের রোযা ফরয করে আল্লাহ বলছেন "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। আশা করা যায় তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে।"[৩৫] তাকওয়া অর্থ আল্লাহভীতি। তাকওয়া বলতে বুঝি কোন এক অদৃশ্য ভয় যা আমাকে সার্বক্ষণিক তাড়া করে ফিরে। যেমন: কোন মরুভূমি অথবা জনমানব শূন্য এলাকা যেখানে সন্ধ্যা নেমে এলে বিপদ ঘটার সম্ভবনা থাকে। কোন ব্যক্তি তা জানার পর সে আপ্রাণ চেষ্টা করে সন্ধ্যা নেমে আসার আগেই এলাকাটি দ্রুত ত্যাগ বা অতিক্রম করার। এখানে তাকে একটি

---

[৩৪]. এ. জেড. এম. শামসুল আলম, *চাকরি পদোন্নতি ও পেশাগত সাফল্য*, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, ২০০২, পৃ. ৬৮

[৩৫]. আল-কুরআন, ২ : ১৮৩ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

ভয় তাড়া করে, ফলে খুব দ্রুত এলাকা ত্যাগ করার জন্য ভয় তাকে সাহায্য করেছে। ভয়টি হলো, জীবন বা সর্বস্ব হারাবার। কাজেই জীবনের প্রতিটি কাজ সম্পাদন এবং প্রতিটি কথা বলার সময় যদি আল্লাহর ভয় আমাদেরকে তাড়া করে তাহলে আমরা নিজেদেরকে অন্যায় কাজ থেকে রক্ষা করতে পারবো। যিনি তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেন, তিনি মুত্তাকী। এর ফলে সে সকল প্রকার দুর্নীতি বা অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে। এটিই তাকওয়ার সম্মোহনী শক্তি। তাকওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি বিশ্বাস করেন, আল্লাহ আমার সকল কর্মকাণ্ড গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি সর্বশক্তিমান বিধায় আমার প্রতিটি দুর্নীতির জন্য শাস্তি দিবেন এবং প্রতিটি ন্যায়নীতির জন্য পুরস্কৃত করবেন। তিনি জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজের হিসাব সংরক্ষণের জন্য সম্মানিত লেখকবৃন্দ নিয়োজিত করেছেন। পৃথিবীর কেউ না দেখলেও আল্লাহ ঠিকই প্রত্যক্ষ করছেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমেও যা ধরা-ছোঁয়া যায় না আল্লাহর কাছে তাও গোপন থাকে না। কারণ তিনি সামিউল বাছির অর্থাৎ তিনি শোনেন এবং দেখেন। এ ধরনের বিশ্বাসের বাস্তব প্রতিফলনের নাম তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয়। এরূপ বৈশিষ্ট্যের লোক দ্বারা দুর্নীতি সংঘটিত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। এমনি ভাবে অন্যান্য ইবাদাতগুলো সম্মিলিতভাবে একজন ব্যক্তিকে ন্যায়নীতির ওপর চলার জন্য সার্বক্ষণিক চেষ্টা চালিয়ে যায়। যেমন-

ঈমান বিল-গায়িব : অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস। এটি এমন এক বিশ্বাস, যে বিশ্বাস সর্বদা পরাক্রমশালী এক সত্তার ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। যে সত্তা নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও মহাপরিচালক, যিনি সর্বময় ক্ষমতা ও সার্বভৌম শক্তির অধিকারী, যিনি বিশ্বজাহান পরিচালনা করছেন এক মহাপরিকল্পনা মোতাবেক, যিনি গোটা দুনিয়ার প্রতিটি অণু-পরমাণুর পূর্ণ খোঁজ-খবর রাখেন, মানুষের দৈনন্দিন কল্যাণ-অকল্যাণ, ভালো-মন্দ যার নিয়ন্ত্রণাধীন, প্রকৃতি রাজ্যের যিনি মালিক ও নিয়ন্ত্রণকারী। প্রত্যেকেই এক আল্লাহ ও রসূলে বিশ্বাসী এবং প্রত্যেকেই এক আদমের আ. বংশোদ্ভূত, কাজেই ভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সৌহার্দ্য ঈমানেরই অঙ্গ। ঈমানের এ ঐক্য মানুষের পার্থিব সকল কার্যকলাপকে সুসংহত করে। যেহেতু আমরা একই মনিবের গোলাম, তাই একে অপরের ওপর জুলুম করতে পারি না। উল্লেখ্য যে, দুর্নীতি একটি জুলুমও বটে।

নামায : আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় নামায খারাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।"[৩৬] নামাযে পঠিত প্রতি আরবী বাক্যে বান্দা তার মহান প্রভুর দরবারে পুনঃ পুনঃ এ স্বীকৃতিই প্রদান করে যে, সে ভাল ও কল্যাণকর নীতির পক্ষে ও দুর্নীতির বিপক্ষে

---

৩৬. আল-কুরআন, ২৯ : ৪৫ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

কাজ করে। দৈনিক এ ভাবে পাঁচবার স্বীকৃতি প্রদানের ফলে এক সময় বাধ্য হয়ে সত্যিই সে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং ভাল কাজে মনোযোগী হয়।

যাকাত : সমাজের অধিবাসীরা একাধারে নৈতিক, কল্যাণকামী এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন পরস্পরের বন্ধু। আর যাকাত এ শিক্ষাই প্রদান করে থাকে। যেমন আল-কুরআনের ঘোষণা "ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার স্ত্রীলোকেরাই প্রকৃতপক্ষে পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। এদের পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা নেক কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, আল্লাহ ও রসূলের বিধান মেনে চলে। প্রকৃতপক্ষে এদের প্রতিই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন।"[৩৭] সুতরাং এ দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কখনো দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে পারে না।

হজ্জ : সাদা-কালো, বর্ণ-বৈষম্যহীন এক বিশ্ব গঠনের লক্ষ্যে সকলেই একই পোশাকে মাত্র দু'টুকরো কাপড় পরিধান করে দীন-ভিক্ষুকের ন্যায় আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হয়। এখানে কোন ব্যক্তি বা দেশের বিশেষ মর্যাদা ও উঁচু নীচুর শ্রেণী বিন্যাস করা হয় না। রসূলুল্লাহ স. বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠানে অমূল্য বাণী শুনিয়েছিলেন যে, "তোমরা সবাই একে অপরের ভাই এবং প্রত্যেকে সমান। তোমাদের কেউ অন্যের উপর বেশি সুবিধা বা মর্যাদা দাবি করতে পারবে না। একজন আরব অনারব থেকে বেশি মর্যাদাশীল নয় এবং একজন অনারবও আরববাসী থেকে অধিক মর্যাদাশীল নয়।" এভাবে হজ্জ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে এবং সমাজ ব্যবস্থায় ন্যায়নীতির ভাবধারা চালু হয়। ইসলামের এই টুলসগুলো আইনের আওতায় এনে বাস্তবায়ন করা হলে সমাজব্যবস্থায় দুর্নীতি থাকবে না। যেই মহান রব মানুষকে সৃষ্টি করে মানুষেরই চির শত্রু শয়তানের অভয়ারণ্যে ছেড়ে দিলেন, শয়তানের সাথে যুদ্ধ করে নৈতিকতার সাথে টিকে থাকার জন্য সেই মহান রব উল্লেখিত বিধানগুলো আমাদের দিয়েছেন। এ ছাড়াও আল-কুরআন ও আল-হাদীস ক্রমাগতভাবে একটি সুন্দর সমাজ তথা রাষ্ট্র কায়েম করার উপড় অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এমন কি মানুষের কষ্ট হয় এমন একটি ছোট ব্যাপারও ইসলাম বাদ দেয়নি। আবু মূসা রা. বলেন, "সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! কোন মুসলিমের ইসলাম সবচেয়ে ভাল? তিনি বলেন, ঐ মুসলিমের ইসলাম সবচেয়ে ভাল যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।"[৩৮] ইসলাম এক সর্বজনীন ও কল্যাণকামী জীবনব্যবস্থা । আজ থেকে পনেরো শত বৎসর আগে রসূলুল্লাহ স.-এর হাতে গড়া রাষ্ট্রটির দিকে দৃষ্টি

---

৩৭. আল-কুরআন, ৯ : ৭১ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ

৩৮. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : সিকাতুল কিয়াসা, অনুচ্ছেদ : ......, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০৩

নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, তিনি আল্লাহর দেয়া ঐ কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে এমন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যে সমাজের অধিবাসীরা কতটুকু আল্লাহর ভয় পোষণ করার ফলে সাধারণ কোন অপরাধ করার পর পরই বিবেকের ক্রমাগত কশাঘাতে টিকতে না পেরে সাথে সাথে রসূলুল্লাহ স.-এর বিচারালয়ে নিজের দুর্নীতির বিচার প্রার্থনা করতেন। আর এ ধরনের তাকওয়া ভিত্তিক রাষ্ট্রের উন্নয়নকল্পে আল্লাহ আসমান ও জমিনের দুয়ারসমূহ খুলে দেন। আল্লাহ বলেন "লোকালয়ের মানুষগুলো যদি ঈমান আনতো ও তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করতো তাহলে আমি তাদের ওপর আসমান-জমিনের যাবতীয় বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম, কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। সুতরাং তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য আমি তাদের পাকড়াও করলাম।"[৩৯]

এ ধরনের তাকওয়া সম্পন্ন জনগোষ্ঠি নিয়ে যে সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠবে, সেটিই হবে আল-কুরআনের সমাজ, ইসলামী সমাজ ও আল্লাহর পছন্দের সমাজ। এ সমাজের প্রতিটি লোক ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর কাছে সম্মানিত হবেন। দুর্নীতির মূলোচ্ছেদে পৃথিবীর কোন জীবন ব্যবস্থাই সম্পূর্ণরূপে সফল হতে পারে নি; যেমন পেরেছে ইসলাম। তাই ইসলামের Code of ethics গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের অর্থনীতির জন্য, রাজনীতির জন্য, ব্যবসার জন্য, জীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্যই রয়েছে Code of ethics. বিশেষ করে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে।[৪০] মানুষের মজ্জাগত অভ্যাসকে পরিবর্তন করার জন্য ইসলামের শাশ্বত বিধান ও পদ্ধতির অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন। দুর্নীতি একটি মজ্জাগত পদ্ধতি। দুর্নীতির মধ্যে ব্যক্তি স্বার্থ নিহিত রয়েছে। কিন্তু খারাপ দিকটি ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে বেশী। সুতরাং দুর্নীতি সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এ জন্য ব্যাপক প্রচার ব্যাপক প্রপাগাণ্ডা চালাতে হবে।

আল্লাহ মদ সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত মতামত জানালেন, "হে মুমিনগণ! মদ,...... শয়তানী কাজ। সুতরাং তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৪১] একইভাবে দুর্নীতি একটি শয়তানী কাজ। সুতরাং তা বর্জনীয়। আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়।"[৪২] আর এ কথা তো বলাই বাহুল্য যে, দুর্নীতি মন্দ কাজের অন্যতম।

---

৩৯. আল-কুরআন, ৭ : ৯৬

৪০. শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, *মাসিক পৃথিবী*, ডিসেম্বর- ২০০৭, পৃ. ৩৪-৩৫

৪১. আল-কুরআন, ৫ : ৯০ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

৪২. আল-কুরআন, ২৪ : ২১ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

রসূলুল্লাহ স.-এর প্রক্রিয়া অনুসরণ

দুর্নীতিমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য রসূলুল্লাহ স. প্রদর্শিত পথ অনুসরণ সময়ের দাবি। আমাদের দেখতে হবে, দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত তৎকালীন একটি সমাজকে তিনি কিভাবে দুর্নীতিমুক্ত করেছিলেন। দুর্নীতি সমস্যার সমাধানের জন্য আপাততঃ দুর্নীতির আগে ন্যায়নীতির প্রতি গভীর ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর নিমিত্তে সর্বপ্রথম ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার চিন্তা ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে হবে। এটিই উত্তম পন্থা এবং এ পন্থায় দুর্নীতি দমন সম্ভব। রসূলুল্লাহ স.-এর পবিত্রতম জীবন চরিত থেকে আমরা সে শিক্ষাই পাই। মহানবী স. তৎকালীন অধঃপতিত সমাজকে দুর্নীতির গভীর খাদ থেকে উদ্ধারের নিমিত্তে এর ইতিবাচক দিক তথা ন্যায়নীতি বিকাশের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ জন্য সর্বপ্রথম তিনি মানুষের মন-মননে 'আল্লাহ্ ও আখিরাতের ভয়' জাগ্রত করার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। এ জন্য তিনি নেতিবাচক তথা উদ্যতভাব, খড়গহস্ত ও কর্কশভাষী হন নি। বরং তাঁর মনের সবটুকু দরদ ঢেলে দিয়ে, একান্ত অকৃত্রিম হিতাকাংখী সেজে ও অত্যন্ত কোমলভাবে মানুষকে বুঝিয়েছেন। যার স্বীকৃতি স্বয়ং আল্লাহ এভাবে করেছেনঃ "আপনি যে কোমল হৃদয় হতে পেরেছেন, তা আল্লাহর অনুগ্রহেরই ফল। কিন্তু আপনি যদি কঠিন হৃদয় ও কর্কশভাষী হতেন তাহলে তারা সকলে আপনাকে ছেড়ে চলে যেত।"[৪৩] আল্লাহ আরো বলেনঃ "ভালো ও মন্দ কখনো সমান হতে পারে না। মন্দকে ভালো পন্থায় প্রতিরোধ করো। তখন দেখবে, তোমার সাথে যার শত্রুতা, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে"।[৪৪] তিনি মানুষকে তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং মানব কল্যাণমুখী সমাজ কায়েমের আহবান জানাতেন। আল-কুরআনে অঙ্কিত আখিরাতের ভয়াবহ দৃশ্য উপস্থাপন করতেন। পাশাপাশি চুরি, ব্যভিচার, সন্তান হত্যা, মিথ্যা বলা, রাহাজানি করা, আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরানো প্রভৃতি কাজ থেকে বিরত রাখা ও তাদের মনে ঘৃণা জন্মানোর চেষ্টা করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল আত্মার পবিত্রতা সাধন, মন মানসে মলিনতা, শোষণ, জৈবিক ও পাশবিক পংকিলতাসমূহ প্রক্ষালন করে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদাকে পুনরুদ্ধার করা। তিনি শারীরিক বশ্যতার আগে আত্মার আনুগত্যশীলতাকে উজ্জীবিত করেছেন। কারণ আল্লাহর ভয় যার মনকে বিচলিত করে না, মানুষের ভয় তাকে কিভাবে বিচলিত করবে?

---

৪৩. আল-কুরআন, ৩ : ১৫৯ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

৪৪. আল-কুরআন, ৪১ : ১৮। وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

সুতরাং দুর্নীতিকে সমূলে উচ্ছেদ করে মানুষকে দানশীল, উদার, সহানুভূতিশীল, মানব-দরদী ও পারস্পরিক কল্যাণকামী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মকভাবে ইসলামের দিকেই ফিরে আসতে হবে। এ জন্য রসূলুল্লাহ্ স.-এর দেখানো ইতিবাচক পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে। এ জন্য তিনি আল্লাহর দেয়া প্রতিটি আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ ইসলামের প্রতিটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত দুর্নীতি দমনে সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালায়। যে সমাজে বা রাষ্ট্রে এগুলো প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে দুর্নীতির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তবে এ বিধানগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের। আল্লাহ্ বলেন, "তাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করি তাহলে তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে, ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে।"[৪৫] আল্লাহ্ আরো বলেন: "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে আর অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর এরাই সফলকাম।"[৪৬]

তাই আমরা যদি আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে অপরাধ আর দুর্নীতি করার ইচ্ছা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারি এবং পরকালে আল্লাহর কাছে পাপ-পুণ্যের হিসাব দেয়ার ভয় সমাজের প্রতিটি মানুষের অন্তরে জাগ্রত করতে পারি তাহলে আমাদের দ্বারা অপরাধ করা আর সহজ হবে না। বরং ন্যায়নীতি মেনে চলা আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হবে। তখন দেশ উন্নতির দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবে আর মানুষের মধ্যে বিরাজ করবে শান্তি।

ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন

দুর্নীতি একটি মারাত্মক অপরাধ। আর অপরাধ যে কোন সমাজ-সভ্যতায় শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি। মানবজীবনে অপরাধ অশান্তি ও অকল্যাণ বয়ে আনে। এই অপরাধ প্রবণতা থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ্ স. প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। ইসলামের মৌলিক টুলস্ তথা নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রতিবন্ধকতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও কেউ যদি অপরাধে লিপ্ত হয় তখন ইসলাম তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

---

[৪৫]. আল-কুরআন, ২২ : ৪১। الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

[৪৬]. আল-কুরআন, ৩ : ১০৪। وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

ইসলামের শাস্তি আইনগুলো বাহ্যত কঠোর মনে হলেও প্রতিটি আইনের পিছনে একটি সুপ্ত রহস্য ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেমন ইসলামের কিসাস সম্পর্কিত আইন বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী"।[৪৭]

আল্লাহ বলেছেন, "যে সব লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি হচ্ছে, তাদেরকে হত্যা করতে হবে কিংবা শূলিবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদের নির্বাসিত করা হবে।"[৪৮]

সাধারণ আইনে অপরাধ সংক্রান্ত সকল শাস্তিকেই 'দণ্ডবিধি' নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ইসলামের শাস্তি আইনগুলো একটু কঠিন মনে হলেও প্রতিটি শাস্তির আলাদা আলাদা বিধান রয়েছে।

দুর্নীতি একটি অপরাধ ঃ 'অপরাধ' বলতে শরীয়তের এমন আদেশ ও নিষেধ বুঝায় যা লঙ্ঘন করলে হদ্দ বা তা'যীর প্রযোজ্য হয়।[৪৯] দুর্নীতি একটি অপরাধ, যে সম্পর্কে আল্লাহ হদ্দ (বিধিবদ্ধ শাস্তি) অথবা তা'যীর (দন্ডবিধি) দ্বারা হুমকি প্রদান করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিশাপ এবং পরকালে জাহান্নামের শাস্তির ওয়াদা করা হয়েছে।[৫০] শাস্তির মাত্রার দিক থেকে অপরাধ তিন প্রকার: (ক) হদ্দ এর আওতাভুক্ত অপরাধ: যেসব অপরাধের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে শাস্তি নির্ধারিত। যেমন: যিনা (ব্যভিচার), যিনা এর মিথ্যা অপবাদ (কায্ফ), চুরি (সারাকা), ডাকাতি (কাতউত তারীক), মাদক গ্রহণ (শুরবুল খাম্র) এবং ইসলাম ধর্ম ত্যাগ (ইরতিদাদ); (খ) কিসাস ও দিয়াতের আওতাভুক্ত অপরাধ: যেসব অপরাধের জন্য কিসাস (মৃত্যুদণ্ড বা অঙ্গহানী) অথবা দিয়াত (রক্তপণ) নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন: ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হত্যা এর অন্তর্ভুক্ত এবং (গ) তা'যীরের আওতাভুক্ত অপরাধ: আল্লাহ বা মানুষের অধিকার-সংশ্লিষ্ট যে সব অপরাধের জন্য শরীয়ত নির্দিষ্ট

---

৪৭. আল-কুরআন, ২ : ১৭৮ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى

৪৮. আল-কুরআন, ৫ : ৩৩ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

৪৯. আল-মাওয়ারদী, *আল-ওলায়াতুত দীনিয়া ফিল আহকামিস সুলতানিয়া*, বৈরূত : ১৯৭৮, পৃ. ২১৯

৫০. ড. মোহাম্মদ মোস্তাফা কামাল, *মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত

কোন শাস্তি কিংবা কাফ্ফারা নির্ধারণ করে দেয়নি সে সব অপরাধের শাস্তিকে তা'যীর (অনির্ধারিত শাস্তি) বলে।[৫১]

তা'যীর অপরাধ ঃ তা'যীর পর্যায়ের অপরাধগুলোর মধ্যে দুর্নীতিসমূহ অন্যতম।[৫২] এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্যায় অপকর্ম থেকে অপরাধীকে বিরত রাখা।[৫৩] আর ইসলামী শাস্তি আইনের উদ্দেশ্য হলো: ১. মানুষের মৌলক বিষয়সমূহের সংরক্ষণ; ২. সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং ৩. অপরাধীকে পবিত্রকরণ।[৫৪] হুদুদ ও কিসাস জাতীয় কয়েকটি অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট সব অপরাধই তা'যীরী অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। যেহেতু দুর্নীতি তা'যীরের পর্যায়ের একটি অপরাধ সেহেতু এর শাস্তিও তা'যীরের অনুরূপ।[৫৫] তা'যীরী শাস্তি হচ্ছে: অপরাধের ভিন্নতার কারণে শাস্তির ভিন্নতা হবে। যেমন, (ক) হত্যা: ইসলামী ফৌজদারী আইনের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তা'যীরের আওতায় কাউকে হত্যা করা সমীচীন নয়। আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা এমন কাউকে বিনা অধিকারে হত্যা করো না, যার হত্যা আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছেন"।[৫৬] ইমাম ইবনু তাইমিয়া র. বলেন, "বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আক্রমণকারীর মতই। যদি আক্রমণকারী হত্যা ছাড়া অবদমিত না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে"।[৫৭] (খ) বেত্রাঘাত করা, (গ) বন্দী করা, (ঘ) নির্বাসন বা দেশ থেকে বহিষ্কার, (ঙ) শূলে চড়ানো, (চ) উপদেশ বা তিরস্কার কিংবা ধমকদান, (ছ) অপমান করা, (জ) বয়কট, (ঝ) আদালতে তলব, (ঞ) চাকুরীচ্যুতকরণ, (ট) সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেয়া, (ঠ) কাজ কারবারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, (ড) উপায় উপকরণ ও সম্পদ নষ্ট করা, (ঢ) সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা এবং (ণ) আর্থিক দণ্ড আরোপ করা।[৫৮] আল্লাহ্ বলেছেন, "আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অবৈধ পদ্ধতিতে ভক্ষণ করো না

---

[৫১]. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন,* ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, ২০০৯, পৃ. ২৯

[৫২]. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম,* ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ১৮১

[৫৩]. সম্পাদনা পরিষদ, *অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল,* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, পৃ. ৯৫

[৫৪]. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন,* ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯, পৃ. ৩২-৩৩

[৫৫]. প্রাগুক্ত, পৃ.৩১২

[৫৬]. আল-কুরআন, ৬ : ১৫১ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

[৫৭]. ইবনু তাইমিয়া, *আল-ফাতাওয়া,* তা. বি., খ. ২৮, পৃ. ২৪৭

[৫৮]. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪-৩২২

[৫৮]. আল-কুরআন, ২ : ১৮৮ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

এবং শাসকদের সামনেও এগুলোকে এমন কোন উদ্দেশ্যে পেশ করো না যার ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে তোমরা অন্যের সম্পদের কিছু অংশ খাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাও।"[৫৯]

সুপারিশমালা

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে গোটা বিশ্বকে একটি Global Village মনে করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে অপেক্ষাকৃত কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলো অধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর সংস্পর্শে এসে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। IMF, World Bank, USA পলিসি ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার পাশাপাশি অনেক NGO দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে।

দুর্নীতিদমনে দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়িত্ব-কর্তব্য, ভূমিকা ও আইনগত বাধ্যবাধকতা অনেক বেশি। মালোয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডা. মাহাথির মোহাম্মদ বলেছিলেন, "ঘুষ যদি টেবিলের উপরে উঠে যায় তা হলে আমার করণীয় কিছুই নেই, আর যদি নিচে থাকে তাহলে এক্ষুণি প্রতিরোধ করা সম্ভব"। বর্তমানে আমাদের জাতীয় জীবনে ঘুষ, দুর্নীতির অবস্থান কোথায় তা সহজেই অনুমেয়। তাই দুর্নীতি দমনে কিছু সুপারিশমালা তুলে ধরা হলো:

১. দুর্নীতিমুক্ত পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ধর্মীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ এবং তাকওয়ার (আল্লাহভীতি) ব্যাপক অনুশীলন হওয়া প্রয়োজন;

২. ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে দুর্নীতির ভয়াবহ পরিণতি ও কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন;

৩. রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন, এ ক্ষেত্রে সৎ, যোগ্য ও দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরির জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সম্পূরক অধ্যায় চালু করা যেতে পারে;

৪. সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার মানদণ্ড রক্ষা করা উচিত; এ বিষয়ে লিখিত অঙ্গিকারনামা ও মৌখিক শপথ নেয়া উচিত যে, তিনি কোন পর্যায়ে নিজেকে দুর্নীতির সাথে জড়াবেন না;

৫. রাজনৈতিক পক্ষপাত ও স্বজনপ্রীতি মুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলা প্রয়োজন;

৬. সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পদমর্যাদা ও দ্রব্যমূল্য সামনে রেখে সম্মানজনক জীবন-জীবিকার উপযোগী বেতনভাতা নির্ধারণ করা প্রয়োজন;

উল্লেখ্য সুইডেন, আর্জেনটিনা, পেরু, সিংগাপুরসহ বিভিন্ন দেশে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা জীবন-জীবিকার উপযোগী বলে সেখানে দুর্নীতি অনেক কম;

৭. সকল ক্ষেত্রে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন;

৮. সৎ, যোগ্য ও দক্ষ প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে নিরপেক্ষ অডিট ব্যবস্থা, স্বচ্ছ মনিটরিং পদ্ধতি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চতকরণ এবং সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও তথ্য সংরক্ষণ;

৯. দুর্নীতি দমন কমিশনকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে এবং দুদককে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তির ক্ষমতা দিতে হবে;

১০. জনপ্রতিনিধিদের ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মানসিকতার উন্নতি করতে হবে, যাতে দুর্নীতির মত ঘৃণ্য কাজকে ঘৃণার চোখেই দেখে এবং দুর্নীতি থেকে বিরত থেকে নিজেদেরকে মডেল হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে;

১১. দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র ও প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা। জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রাইভেট চাকরিজীবী ও সাধারণ জনগণকে এ পরিকল্পনার অধীনে নিয়ে আসতে হবে এবং সকলকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ দিয়ে সততা ও নৈতিকতার আদর্শে উজ্জীবিত করতে হবে।

১২. দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রণীত কর্মসূচির সাথে আলেম-ওলামা, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং মসজিদের ইমাম ও খতবীগণকে সম্পৃক্ত করা এবং তাঁদের মাধ্যমে সমন্বিত উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি চালু করা;

১৩. দুর্নীতি প্রবণতার কারণসমূহ উদঘাটন করে সে আলোকে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৪. সংবাদপত্রের আদর্শিক স্বাধীনতা দিতে হবে;

১৫. প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে;

১৬. ইসলামের শাস্তি বিধান (ইসলামী ফৌজদারী আইন) চালু করা;

১৭. কুরআনে বর্ণিত দুর্নীতি প্রতিরোধের আয়াতসমূহের ব্যাপক প্রচার করা;

১৮. দুর্নীতির ভয়াবহতা ও পরিণাম সম্বলিত হাদীসের ব্যাপক প্রচার করা;

১৯. সর্বোপরি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় দুর্নীতি বিরোধী ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে আরো গণসচেতনতা ও জনমত সৃষ্টি করতে হবে।

উপসংহার

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে দুর্নীতির মত দুষ্টক্ষত সামাজিক ও জাতীয় জীবনের উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সবাইকে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আশার কথা হচ্ছে, ইসলামপ্রিয় বাংলাদেশী জনসাধারণ এর অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত দেখতে চায়। এ জন্য সমাজের তথা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে। পরকালে এর ভয়াবহ পরিণামের কথা তুলে ধরতে হবে। অন্যথায় দুর্নীতি যেভাবে মহামারী আকারে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ছড়িয়ে পড়েছে তার করাল গ্রাস থেকে আমরা কেউই রেহাই পাব না। দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা যায় কিন্তু শান্তি অর্জন করা যায় না। অপরাধ আর অশান্তি একটা আরেকটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যারা ন্যায়নীতি মেনে চলে তাদের অন্তরে শান্তি বিরাজমান থাকে। দুনিয়াতে অপরাধের শাস্তি হোক বা না হোক আখিরাতে সব অপরাধের বিচার হবে। তখন অন্যায়ভাবে উপার্জিত সম্পদ কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। তবে যারা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে অন্তর পবিত্র করেছেন, অপরাধ ছেড়ে দিয়ে সৎভাবে জীবন যাপন করেছেন তারা আল্লাহর কঠিন আযাব থেকে যেমন রক্ষা পাবেন তদ্রূপ অভাবনীয় পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হবেন। দেশের প্রতিটি নাগরিককে এ পথে পুরোপুরি ফিরে আসতে হবে।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮ সংখ্যা-৩২
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১২

বাংলাদেশের পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ও ইসলামী নৈতিকতা : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক*
ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন**

[সারসংক্ষেপঃ *বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় স্যাটেলাইট, মোবাইল প্রযুক্তি, ইন্টারনেট, সাইবার ক্যাফে এবং পর্ণো সিডির মাধ্যমে অশ্লীল ভিডিও ও স্থিরচিত্র ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষের পারিবারিক জীবন বিভিন্ন প্রকার জটিল সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ বিষয়ে কঠোর আইন ও তার যথাযথ প্রয়োগ থাকলেও বাংলাদেশে এ বিষয়ক আইনের অনুপস্থিতি পর্ণোগ্রাফির ভয়াবহতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এর ফলে নারীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে। এ প্রেক্ষাপটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ ২০১২ নামে আইন প্রণয়ন করে। নতুন আইনে পর্ণোগ্রাফি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর সংজ্ঞায়ন, তদন্ত পদ্ধতি, শাস্তির মেয়াদ এবং আপিল সংক্রান্ত বিষয়ে বলা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে পর্ণোগ্রাফি সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রদত্ত বিবৃতিতে আইনটি প্রণয়নের প্রাসঙ্গিকতা ফুটে উঠেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে পর্ণোগ্রাফি-এর সংজ্ঞা, বাংলাদেশে পর্ণোগ্রাফী পরিস্থিতি, পর্ণোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইন, পর্ণোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণে ইসলামী নৈতিকতা, তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং সুপারিশমালা স্থান পেয়েছে।*]

সংজ্ঞা : পর্ণোগ্রাফি বলতে প্রকাশ্যে যৌনতা উৎপাদন ও প্রদর্শন করাকে বুঝায়। পাশ্চাত্য জগত স্বতন্ত্র শিল্পের দাবি নিয়ে প্রাপ্ত বয়স্কদের চিত্তবিনোদনের জন্য আইনের স্বীকৃতিসহ আবির্ভূত প্রকাশ্যে যৌনদৃশ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, বাজারজাত ও বিপণন করে। এটা সত্য যে, আদিকাল থেকেই নারী-পুরুষের শারীরিক সম্পর্কের উপস্থাপন নানাভাবে হয়েছে। সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা ও স্থাপত্যে নানাভাবে শিল্পসম্মত উপায়ে যৌনতা উপস্থাপিত হয়েছে। যৌনতার শিল্পসম্মত উপস্থাপন শিল্প, সাহিত্য ও জীবনবোধকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু টেলিভিশন, ভিডিও ও ইন্টারনেট আবিষ্কারের পর 'প্রাপ্ত বয়স্কদের চিত্তবিনোদন' বা মনোরঞ্জনের কথা বলে পর্ণো ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন দেশে পর্ণোগ্রাফির বিপুল চাহিদা সৃষ্টির পাশাপাশি

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০
** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০

পর্ণো বাণিজ্যের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে এর পিছনে অত্যন্ত শক্তিশালী অর্থনৈতিক কার্যকারিতাকে যৌক্তিকরূপে দৃশ্যমান করে তোলা হচ্ছে। অথচ সমাজের ওপর তার ফলাফল মারাত্মক নেতিবাচক। পর্ণোশিল্প শিশু, নারী-পুরুষ ও সমাজে বিষাক্ত দূষণ ছড়িয়ে দিচ্ছে। শিশু পর্ণোগ্রাফি কোমলমতি শিশুদের সুন্দর মনকে অজ্ঞাতসারে বিষিয়ে তুলছে। পর্ণোগ্রাফির ক্ষতিকর প্রভাবে ধর্ষণ, যৌন অপরাধ এবং পুরুষ-নারীর বিপথগামী আচরণ বাড়ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও অনেক দিন ধরে অশ্লীল ছবি ও চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী চলছে এবং মুঠোফোনের মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফি ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। অথচ বাংলাদেশের সংস্কৃতি, প্রচলিত মূল্যবোধ ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধ পর্ণোগ্রাফি বা অশ্লীল ছবির উৎপাদন, সংরক্ষণ. বাজারজাতকরণ ও প্রদর্শনীকে অনুমোদন করে না। এখানকার জনসাধারণের অধিকাংশের ধর্ম ইসলামে পর্ণোগ্রাফিসহ সব ধরনের অশ্লীলতা নিষিদ্ধ।

বাংলাদেশে পর্ণোগ্রাফি পরিস্থিতি

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে পর্ণোগ্রাফি মহামারী আকার ধারণ করেছে। ইন্টারনেটে ব্যাপকহারে পর্ণো ভিডিও ও স্থির ছবি আপলোড এবং ডাউনলোড, রাস্তার পাশে প্রকাশ্যে পর্ণো সিডি বিক্রি, পত্রিকার দোকানে পর্ণো ম্যাগাজিন বিক্রি এবং মোবাইলের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে তা ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ায় পর্ণোগ্রাফি এখন খুবই সহজলভ্য হয়ে গেছে। দেশের যুব সমাজের একটি বিশাল অংশ এ ঘৃণ্য কাজটিকে বিনোদন হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে উঠতি বয়সের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পর্ণোগ্রাফির চাহিদাও দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে।

বাংলাদেশে পেশাদার পর্ণোগ্রাফি-অভিনেত্রী বা তারকা অনুল্লেখ্য; বরং এসব পর্ণোগ্রাফির চিত্রে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, নাট্য ও চিত্র অভিনেত্রী এবং গৃহবধুর সংখ্যাই বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেম-ভালোবাসা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন পরিবেশে মেয়েদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শারীরিক মেলামেশার ভিডিও এবং স্থিরচিত্র ধারণ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ঐ বখাটে তরুণরাই তরুণীদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করে। পরে তা তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিয়ে হয়রানি করে। বিভিন্ন অসাধু মহল ব্যবসায়িক লাভের জন্য কর্মরত নারীদের ভিডিও বা স্থিরচিত্র ধারণ করে। হয়রানির শিকার নারীকে এসব ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও মানসিকভাবে হেনস্তার শিকার হয়ে কখনো কখনো আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে দেখা যায়।

বাংলাদেশে পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আইন

পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানা আইন রয়েছে। ব্রিটেনে 'অবসিনিটি পাবলিকেশনস অ্যাক্ট ১৮৫৭' -এর মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফি নিষিদ্ধ করা হয়। বর্তমানে আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদনের একটি প্রধান

মাধ্যম হলো পর্ণোগ্রাফি। তবে শিশু পর্ণোগ্রাফি, প্রপাশবিকতা ও নিষ্ঠুর যৌনতার প্রদর্শনীর ওপর আইনি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ওসব দেশের পর্ণোগ্রাফি আইনের সারকথা হচ্ছে, প্রাপ্তবয়স্ক যে কেউ স্বেচ্ছায় পর্ণো ফিল্মে অংশ নিতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক যে কেউ ওয়েবসাইট থেকে বা দোকান থেকে পর্ণোগ্রাফির ভিডিও কিনে তা দেখতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকবার পর্ণোগ্রাফি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও বিপণন নিয়ন্ত্রণ করে প্রণীত আইনকে আদালত অবৈধ ঘোষণা করেছে এবং যুক্তি পেশ করেছে যে, ওই আইনগুলো নাগরিক অধিকারের লঙ্ঘন। উপরন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত আইনে মারাত্মক এক স্ববিরোধিতা রয়েছে। সেখানে একদিকে পতিতাবৃত্তি অবৈধ, অপরদিকে পর্ণোগ্রাফি বৈধ। এ স্ববিরোধিতা নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা ও বিতর্ক রয়েছে। তবে পশ্চিমা দেশগুলোতে শিশু পর্ণোগ্রাফি নিষিদ্ধ।

বাংলাদেশ পশ্চিমা প্রভাবে প্রভাবিত অনেক এশিয়ান সমাজ থেকেও ভিন্ন। এখানে পর্ণোগ্রাফি উৎপাদন, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও বিপণনকে রোধ করার জন্য সরাসরি কোনো আইন এতদিন ছিল না। দণ্ডবিধি, ১৮৯৮,[১] সিনেমাটোগ্র্যাফিক অ্যাক্ট, ১৯১৮,[২] সেন্সরশিপ অব ফিল্মস অ্যাক্ট, ১৯৬৩ (সংশোধিত-২০০৬),[৩] এবং তথ্য ও

---

১ *Penal Code, 1860* (Act XLV of 1860)

২ THE CINEMATOGRAPH ACT, 1918. (ACT II OF 1918), (As amended by the Cinematograph (Amendment) Ordinance, 1982), aviv- 2 [Definitions-2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,- (a) "cassette" means a magazine or container of ferromagnetic recording tapes having the operating characteristic of being directly loaded into magnetic tape recording or re-producing machine; (b) "cinematograph" means a composite equipment including a video-cassette recorder used for production, projection and exhibition of motion picture film; (c) "film", in relation to a motion picture, means a thin flexible ribbon of transparent material having perforations along one or both edges and bearing a sensitized layer or other coating capable of producing photographic images; and includes unexposed film, exposed but unprocessed film and exposed and processed film; (d) "place" includes a house, building, tent or vessel; (e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act; and (f) "video-cassette recorder" means an electromagnetic equipment for recording and reproducing motion picture and sound signals simultaneously on cassette tapes.], 3 [Cinematograph exhibition to be licensed 3. Save as otherwise provided in this Act, no person shall give an exhibition

যোগাযোগপ্রযুক্তি আইন ২০০৬,[৪] আইনসমূহের কিছু ধারা দিয়ে পর্ণোগ্রাফির উৎপাদন ও বিপণনকে পরোক্ষভাবে মোকাবিলা করা যায়, যা এ ধরনের একটি সামাজিক বিপদকে প্রতিরোধ করার জন্য খুবই অপর্যাপ্ত। ফলে পর্ণোগ্রাফির বিরুদ্ধে এতোদিন সুনির্দিষ্ট আইন না থাকার কারণে আইনগত যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া যায়নি।

বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী বা যৌন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য প্রতিরোধমূলক বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে হাইকোর্টের নির্দেশনা জরুরী বিবেচিত হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে যৌন হয়রানীমূলক সকল প্রকার নির্যাতন প্রতিরোধে মহামান্য হাইকোর্টের দিকনির্দেশনা চেয়ে জনস্বার্থে একটি মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলার প্রেক্ষিতে ১৪ মে, ২০০৯ হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ও বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দীকি সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ একটি দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রদান করেন। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন না হবে ততদিন পর্যন্ত সকল সরকারি-

---

by means of a cinematograph elsewhere than in a place licensed under this Act, or otherwise than in compliance with any conditions and restrictions imposed by such license.], 5. (2) [5. (2) If any person is convicted of an offence punishable under this Act committed by him in respect of any cinematograph, film or cassette, the convicting Court may further direct that the cinematograph, film or cassette shall be forfeited to the Government.]

৩ *THE CENSORSHIP OF FILMS ACT, 1963.* Act No. XVIII of 1963 (As amended by President's Order No. 41 of 1972, Ordinance No. LV111 of 1982 and Act No. 1 of 2006)

৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) [৮ অক্টোবর ২০০৬ ইং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইনগত বৈধতা ও নিরাপত্তা প্রদান এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।] ধারা -৫৭। (১)-(২), [ইলেক্ট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড: ৫৭ (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েব সাইটে বা অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ। (২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক দশ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।]

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে এই নীতিমালা অনুসরণ এবং পালন করা হবে। নীতিমালার ৪ ধারায় যৌন হয়রানীর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

"যৌন হয়রানী বলতে বুঝায়- ক) অনাকাঙ্খিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে) যেমনঃ শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের প্রচেষ্টা; খ) প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা; গ) যৌন হয়রানী বা নিপীড়নমূলক উক্তি; ঘ) যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন; ঙ) পর্ণোগ্রাফী দেখানো; চ) যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গী; ছ) অশালীন ভঙ্গী, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা, কাউকে অনুসরণ করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কোন ব্যক্তির অলক্ষ্যে তার নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা; জ) চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরী, শ্রেণীকক্ষ, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কোন কিছু লেখা; ঝ) ব্লাকমেইল অথবা চরিত্র লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ করা; ঞ) যৌন হয়রানীর কারণে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হওয়া; ট) প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা; ঠ) ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনে চেষ্টা করা।"[৫]

উক্ত নীতিমালার মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফিকেও নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অবশেষে ২ মে, ২০১১ মন্ত্রিসভার এক নিয়মিত বৈঠকে পর্ণোগ্রাফি তৈরি ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ করে 'পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১১' শিরোনামে একটি আইনের খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং নীতিগতভাবে অনুমোদন দেয়া হয়।[৬] পরবর্তীতে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রাপ্তির পর জাতীয় সংসদের স্পিকারের অনুমতিক্রমে ২৯ জানুয়ারি-২০১২ সংসদে বিল উত্থাপন করা হয়।[৭] নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধকল্পে বিলটি প্রণয়ন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। আইন প্রণয়নের কারণ হিসেবে বিলের শুরুতে বলা হয়েছে, পর্ণোগ্রাফি প্রদর্শনের ফলে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে এবং বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে এবং সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করতেই বিলটি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতিতে বলা হয়, "বর্তমানে চলচ্চিত্র,

---

[৫] *যৌন হয়রানিমুক্ত শিক্ষা ও কর্মপরিবেশ তৈরিতে মহামান্য হাইকোর্ট প্রদত্ত নীতিমালা*, ধারা-৪ (১)

[৬] প্রথম আলো, *পর্ণোগ্রাফির সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছরের কারাদণ্ড*, ২ জানুয়ারী-২০১২

[৭] প্রথম আলো, *পর্ণোগ্রাফি বিল উত্থাপন, সর্বোচ্চ শাস্তি ৭ বছর কারাদণ্ড*, ২৯ জানুয়ারী-২০১২

স্যাটেলাইট, ওয়েবসাইট ও মোবাইলের মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফি সংক্রামক ব্যাধির মত দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। পর্ণোগ্রাফি যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এর শিকার হয়ে অনেক নারী পুরুষ ও শিশুকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হতে হচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন না থাকায় অপরাধ রোধ ও অপরাধীদের বিচার করা সম্ভব হচ্ছে না। বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।" পরে বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সংসদে রিপোর্ট প্রদানের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়েছে। অবশেষে ২৮ ফেব্রুয়ারী-২০১২ বিলটি 'পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২, আইন হিসেবে মহান জাতীয় সংসদে গৃহিত হয়।[৮] নিম্নে আইনটির উপর একটি সারনির্যাস তুলে ধরা হলো।

পর্ণোগ্রাফির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কোন অশ্লীল সংলাপ, অভিনয়, অঙ্গভঙ্গী, নগ্ন বা অর্ধনগ্ন নৃত্য যা চলচ্চিত্র, ভিডিও চিত্র, অডিও ভিজুয়াল চিত্র, স্থিরচিত্র, গ্রাফিকস বা অন্য কোন উপায়ে ধারণকৃত ও প্রদর্শনযোগ্য এবং যার কোন শৈল্পিক বা শিক্ষাগত মূল্য নেই; যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী অশ্লীল বই, সাময়িকী, ভাস্কর্য, কল্পমূর্তি, মূর্তি, কার্টুন বা লিফলেট এবং উল্লেখিত বিষয়াদির নেগেটিভ ও সফট ভার্সন পর্ণোগ্রাফি হিসেবে গণ্য হবে।[৯]

আইনে বর্ণিত অপরাধ ও তার পরিধি: বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যৌনোদ্দীপনা সৃষ্টি, ব্যক্তির ইমেজ বা মর্যাদা বিনষ্ট করার লক্ষ্যে বা অন্যায় লাভ বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত অশ্লীল সংলাপ, প্রকাশনা, পুরুষ বা নারীর নৃত্য, নগ্ন, অর্ধনগ্ন, চলচ্চিত্র বা ভিডিওচিত্র তৈরি এ আইনের আওতায় পড়বে। এসব পর্ণো সিডি উৎপাদন, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, বহন, আমদানি-রফতানি, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয়, প্রদর্শন অপরাধ। আইনের চতুর্থ ধারায় বলা হয়েছে, পর্ণোগ্রাফি উৎপাদন, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, বহন, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয় ও প্রদর্শন করা যাবে না।[১০]

গ্রেফতার, পরোয়ানা ও তদন্ত: বিলে বলা হয়েছে, পর্ণো সিডি তৈরির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার ও তার আস্তানায় তল্লাশি চালিয়ে আলামত জব্দ করতে পারবে। এ আইনে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির সাত দিনের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা সম্ভব না হলে আদালত একটি জাতীয় দৈনিক

---

[৮] দৈনিক কালের কণ্ঠ, ছোটন মাহমুদ, *মতামত : পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ বিল-২০১২ সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে,* ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১২; দৈনিক কালের কণ্ঠ, নিজস্ব প্রতিবেদক, *পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ বিল সংসদে পাস: সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছরের কারাদণ্ড,* ২৯ ফেব্রুয়ারী-২০১২

[৯] পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন- ২০১২ (২০১২ সনের ৯ নং আইন), ধারা-২

[১০] *প্রাগুক্ত,* ধারা-৪

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেবে। হাজির না হলে তার অনুপস্থিতিতে বিচার হবে। পর্ণোগ্রাফির অভিযোগ পাওয়া গেলে তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) বা তার সম-মর্যাদার কর্মকর্তাকে দিয়ে ৩০ দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে। তদন্তের প্রয়োজনে উর্ধতন কর্মকর্তাদের অনুমতি নিয়ে আরো ১৫ দিন এবং আদালতের অনুমোদন পাওয়া গেলে আরো ৩০ দিন পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা যাবে।[১১]

অভিযুক্তের আইনগত নিরাপত্তা

এ আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য এবং অজামিনযোগ্য হবে।[১২] কেউ এ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করতে পারবে।[১৩] এ ছাড়া আইনে মিথ্যা অভিযোগ দায়েরকারীর জন্যও শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।[১৪]

বিচার ও শাস্তি: পর্ণোগ্রাফির অপরাধের আইন দ্রুত বিচার আইন-২০০২ এর ধারা-৪ সংজ্ঞানুযায়ী গঠিত ট্রাইব্যুনালে অনুষ্ঠিত হবে। বিচার প্রক্রিয়ায় সাক্ষ্য হিসেবে তল্লাশিকালে জব্দকৃত সফট কপি, রূপান্তরিত হার্ডকপি, সিডি, ভিসিডি, ডিভিডি, কম্পিউটার বা অন্য কোনো ডিভাইস, এক্সেসরিজ, মোবাইল ফোনের সিম, যন্ত্রাংশ, অপরাধ কাজে ব্যবহৃত অন্য কোনো যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ, সরঞ্জাম বা বস্তা আদালতে উপস্থাপন করতে হবে।[১৫] কোন ব্যক্তি পর্ণোগ্রাফি উৎপাদন বা এ উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণকারী সংগ্রহ করে চুক্তিপত্র তৈরী করলে অথবা কোন নারী, পুরুষ বা শিশুকে প্রলোভন দিয়ে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে স্থির, ভিডিও বা চলচ্চিত্র ধারণ করলে সর্বোচ্চ সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও দুই লাখ টাকা জরিমানা করার বিধান রাখা হয়েছে। কোন ব্যক্তি পর্ণোগ্রাফির মাধ্যমে অন্য কোন ব্যক্তির সামাজিক বা ব্যক্তি মর্যাদা হানি করলে বা ভয়ভীতির মাধ্যমে অর্থ আদায় বা অন্য কোন সুবিধা আদায় বা কোন ব্যক্তির জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে ধারণকৃত কোন পর্ণোগ্রাফির মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তিকে মানসিক নির্যাতন করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। কোন ব্যক্তি ইন্টারনেট বা ওয়েবসাইট বা মোবাইল ফোন বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফি সরবরাহ করলে

---

১১ *প্রাগুক্ত*, ধারা-৫

১২ *প্রাগুক্ত*, ধারা-১০

১৩ *প্রাগুক্ত*, ধারা-১২

১৪ *প্রাগুক্ত*, ধারা-১৩

১৫ *প্রাগুক্ত*, ধারা-৬

তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[১৬]

কোন ব্যক্তি পর্ণোগ্রাফি প্রদর্শনের মাধ্যমে গণউপদ্রব সৃষ্টি করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। কোন ব্যক্তি পর্ণোগ্রাফি বিক্রয়, ভাড়া, বিতরণ, সরবরাহ, প্রকাশ্যে প্রদর্শন বা যে কোন প্রকারে প্রচার করলে অথবা উক্ত সকল বা যে কোন উদ্দেশ্যে প্রস্তুত, উৎপাদন, পরিবহণ বা সংরক্ষণ করলে; অথবা কোন পর্ণোগ্রাফি প্রাপ্তি স্থান সম্পর্কে কোন প্রকারের বিজ্ঞাপন প্রচার করলে; অথবা এরূপ কোন কার্য সংঘটনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[১৭] সর্বোপরি এ আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বা সহায়তাকারী ব্যক্তি প্রত্যেকেই একই দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।[১৮]

শিশুদের ব্যবহার করলে সর্বোচ্চ শাস্তি: শিশুদের ব্যবহার করে পর্ণোগ্রাফি উৎপাদন ও বিতরণকারীদের জন্য সবচেয়ে বেশি শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এদের জন্য সর্বোচ্চ দশ বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার বিধান রয়েছে।[১৯]

পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে ইসলামী নৈতিকতা

পর্ণোগ্রাফি একটি সর্বজন স্বীকৃত অশ্লীলতা। মানব সমাজকে পুত:পবিত্র এবং বিশৃংখলামুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে ইসলামে সকল প্রকার অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "আপনি বলুন, আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন- যা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহ্‌র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না।"[২০] আল্লাহ্ সকল ধরনের অশ্লীলতা পরিহারের নির্দেশ প্রদান করে বলেন, "আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসংগত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি

---

১৬ *প্রাগুক্ত*, ধারা-৮ (১), (২) ও (৩)

১৭ *প্রাগুক্ত*, ধারা-৮ (৪) ও (৫) এর উপধারা ক, খ ও গ

১৮ *প্রাগুক্ত*, ধারা-৮ (৭)

১৯ *প্রাগুক্ত*, ধারা-৮ (৬)

২০ আল-কুরআন, ৭:৩৩

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

তোমাদেরকে উপদেশ দেন- যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।"[২১] পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী জাতিসমূহ অশ্লীল কাজ সম্পাদন করে তা আল্লাহর নির্দেশ হিসেবে চালিয়ে দিত। তাই আল্লাহ বলেন, "আর যদি আহলে-কিতাবরা বিশ্বাস স্থাপন করত এবং খোদাভীতি অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নেয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাতাম।"[২২]

"তারা যখন কোন মন্দ কাজ করে তখন বলে, আমরা বাপ-দাদাকে এমনি করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। আল্লাহ মন্দ কাজের আদেশ দেন না। তোমরা এমন কথা আল্লাহর প্রতি কেন আরোপ কর, যা তোমরা জান না।"[২৩] আল্লাহ মুসলিম জাতিকে মন্দ কাজ থেকে কেবল দূরে থাকতে আদেশই প্রদান করেননি; বরং এসব অশ্লীল কাজ থেকে জাতিকে দূরে রাখতে যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশও প্রদান করেন। আল্লাহ বলেন, "আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, নির্দেশ করবে সৎ কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হল সফলকাম।"[২৪] অন্যত্র এ কাজকে মুমিনদের পারস্পরিক দায়িত্ব আখ্যা দিয়ে বলেন, "আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[২৫] আর এ ভিন্ন বা উল্টো চরিত্রকে মুনাফিকদের কর্ম হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এ সম্পর্কে বলেন, "মুনাফেক নর-নারী একে অপরের অনুরূপ; তারা পরস্পরকে অসৎকর্মের আদেশ দেয় এবং সৎকর্মে নিষেধ করে।"[২৬]

---

[২১] আল-কুরআন, ১৬:৯০
إنَّ اللهَ يَأمُرُ بالعَدْل وَالإحْسَان وَإيتَاء ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَن الفحْشَاء وَالمُنكَر وَالبَغْي يَعظكُمْ لعَلَكُمْ تَذكَّرُونَ

[২২] আল-কুরআন, ৫:৬৫ وَلَوْ أنَّ أهْلَ الكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ

[২৩] আল-কুরআন, ৭:২৮
وَإِذَا فعَلوا فاحِشَةً قالوا وَجَدْنَا عَليْهَا آبَاءنَا وَاللهُ أمَرَنَا بهَا قلْ إنَّ اللهَ لا يَأمُرُ بِالفحْشَاء أتَقُولونَ عَلى اللهِ مَا لا تَعْلمُونَ

[২৪] আল-কুরআন, ৩:১০৪
وَلتَكُن مِّنكُمْ أمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَأمُرُونَ بالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن المُنكَر وَأوْلـئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ

[২৫] আল-কুরআন, ৯:৭১
وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوْلِيَاء بَعْض يَأمُرُونَ بالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن المُنكَر وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولهُ أوْلـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

[২৬] আল-কুরআন, ৯:৬৭
المُنَافِقُونَ وَالمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْض يَأمُرُونَ بالمُنكَر وَيَنْهَوْنَ عَن المَعْرُوفِ

আল্লাহ 'আমর বিল-মারূফ' এবং 'নাহি আনিল-মুনকার' (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ)-কে মু'মিন ও মুনাফিকদের সাথে পার্থক্যকারী নিদর্শন হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। ফলে কোন মুসলিম অশ্লীল কোন কাজে জড়িত হওয়া তো দূরের কথা; বরং অশ্লীল কাজে বাধার প্রাচীর হয়ে দাড়াঁনো তার দায়িত্ব। রসূলুল্লাহ স. বলেন, "তোমাদের কেউ অন্যায়-অশ্লীল কর্ম দেখলে তা শক্তি দ্বারা প্রতিহত করবে। যদি সমর্থ না হও তাহলে কথার দ্বারা প্রতিবাদ করবে। এতেও সমর্থ না হলে বিবেক দ্বারা প্রতিহত করবে। আর এটিই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।"[২৭] ফলে ইসলাম প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আল্লাহ বলেন, "লজ্জাকর কার্যে জড়িত হয়োনা, সে প্রকাশ্যেই বা গোপনে।"[২৮] ফলে অশ্লীল কর্ম সমাজে ছড়িয়ে দেয়াও মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ বলেন, "যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার লাভ করুক তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"[২৯] কোন নারীকে কটু কথা বলা, খারাপ ইশারা-ইংগিত করা, হয়রানি করা, গালি দেয়া, ঢিল মারা, পথ রুদ্ধ করা যেমন অশ্লীল কাজ তেমনি কোন নারী-পুরুষের বিকৃত স্থির ছবি বা নগ্ন ভিডিও ধারণ ও ছড়িয়ে দেয়া কিংবা প্রত্যক্ষ করা অশ্লীল কাজ। রসূলুল্লাহ স. সবধরনের অশ্লীল কাজকে নিষেধ করে বলেন, "অশ্লীলতা এবং অশ্লীলতার প্রসার কোনটির স্থান ইসলামে নেই। নিশ্চয় ইসলামে সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে যার স্বভাব-চরিত্র সবার চাইতে সুন্দর।"[৩০] ইসলাম এ অপরাধকে সরাসরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পাশাপাশি এ অপরাধ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অযাচিত ও রুচিহীন কয়েকটি কর্মকেও নিষিদ্ধ করেছে। নিম্নে পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে ইসলামের ঐতিহাসিক বিধি-বিধানের প্রায়োগিক দিকসমূহ তুলে ধরা হল-

---

২৭ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ: বায়ানু আন্না-নিহ্য়া আনিল মুনকারি মিনাল ঈমান ওয়া আন্নাল ঈমানা ইয়াযিদু ওয়া ইয়ানকুসু, বৈরূত: দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, তা.বি., পৃ. ৪৬,
ابُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُولُ: " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

২৮ আল-কুরআন, ৬:১৫১ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

২৯ আল-কুরআন, ২৪:১৯
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

৩০ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ,* অধ্যায়: মুসনাদুল আশারাহ আল-মুবাশিশরীনা বিল জান্নাহ, অনুচ্ছেদ: আউয়ালু মুসনাদিল বাসরিয়্যিন, বৈরূত: দারু এহইয়া আল-তুরাস আল-আরাবী, তা.বি., পৃ. ৫২১৩
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم وَأَبِي سَمُرَةَ جَالِسٌ أَمَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم: " إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَاحُشَ لَيْسَا مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ، وَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا "

স্বচ্ছন্দ ও প্রশান্তিপূর্ণ পারিবারিক ব্যবস্থাপনা

ইসলামে বিবাহবন্ধনকে সুস্থ জীবনযাপনের আদর্শ হিসেবে ধরা হয়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিয়ে সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্ম পরায়ণ তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল করে দিবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[৩১] পবিত্র কুর'আনে আলাহ্ যৌনতার একমাত্র বৈধ পন্থা হিসেবে বিবাহ বন্ধনের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন, যার মধ্যে নারী-পুরুষের জন্য পারস্পরিক স্বচ্ছন্দ এবং প্রশান্তি রয়েছে। দাম্পত্য জীবনকে ইসলাম একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান মনে করে এবং তা সংরক্ষণের পরামর্শ দেয়। রসূলুল্লাহ স. বিবাহকেই একমাত্র যৌনতা নিয়ন্ত্রণের সঠিক পদ্ধতি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, "হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহের সামর্থ্য আছে সে যেন বিয়ে করে, কারণ তা দৃষ্টি নিম্নগামী করে এবং যৌনঅঙ্গকে পবিত্র রাখে।"[৩২] পরস্পরের আচরণ সৌহার্দপূর্ণ রাখতে নির্দেশ দিয়ে বলেন, "মুমিনদের মধ্যে পরিপূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি, যার আচার-আচরণ উত্তম। আর তোমাদের মাঝে তারাই উত্তম যারা আচার-আচরণে তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।"[৩৩] এ ক্ষেত্রে কখনোও কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তার সমাধান হবে কীভাবে তিনি তার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। রসূলুল্লাহ স. বলেন, "কোন মুমিন পুরুষ কোন মুমিন নারীর প্রতি বিদ্বেষ রাখবে না। যদি তার একটি অভ্যাস অপছন্দনীয় হয় তবে আরেকটি অভ্যাস তো পছন্দনীয় হবে"।[৩৪]

---

৩১ আল-কুরআন, ২৪:৩২
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

৩২ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়: আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ: ইসতিহবা নিকাহ লিমান তাকাত নাফসুহু ইলাহি, *প্রাগুক্ত*, খ. ৯, পৃ. ১৭২
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ "

৩৩ ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আর-রিদা'আ, অনুচ্ছেদ: মা যাআ ফি হাক্কিল মার'আ আলা যাওজিহা, বৈরূত: দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, তা.বি., পৃ. ৪৪২
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم: " أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا "

৩৪ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়: আর-রিদা'আ, অনুচ্ছেদ: আল-ওয়াসিয়াতু বিন-নিসা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯৪ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم: " لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ "

ইসলামে পরিবারই যেহেতু যৌন চাহিদা পূরণের একমাত্র ক্ষেত্র তাই স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের যৌন চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে। আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "যখন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন সে যেন পরিপূর্ণভাবে (সহবাস) করে। আর তার যখন চাহিদা পূরণ হয়ে যায় এবং স্ত্রীর চাহিদা অপূর্ণ থাকে, তখন সে যেন তাড়াহুড়া না করে।"[৩৫] এভাবে ইসলামে স্ত্রীর যৌন অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে স্বামীকে সতর্ক করা হয়েছে। এমনকি স্বামীর বিরুদ্ধে শাসকের কাছে অভিযোগ করার অনুমতিও দেয়া হয়েছে। আবূ মূসা আল-আশয়ারী রা. থেকে বর্ণিত, ওসমান ইবনে মাযউন রা.-এর স্ত্রী মলিন বদন এবং পুরাতন কাপড়ে রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রীদের কাছে এলেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞেসে করলেন, তোমার এ অবস্থা কেন? তিনি বললেন, এতে আমার কি হবে? কেননা আমার স্বামীর রাত নামাযে কাটে ও দিন রোযায় কাটে। তারপর রসূলুল্লাহ স. প্রবেশ করলেন। তখন রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রীগণ বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলেন। উসমান ইবনে মাযউন রা. এর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি তাকে বললেন, "আমার মধ্যে কি তোমার জন্য কোন আদর্শ নেই?" উসমান রা. বললেন, কী বলেন হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। তখন তিনি বললেন, "তবে কি তোমার রাত নামাযে আর দিন রোযায় কাটে না? অথচ তোমার উপর তোমার পরিবারের হক রয়েছে, তোমার উপর তোমার শরীরে ও হক রয়েছে। তুমি নামাযও পড়বে আবার ঘুমাবের, রোযাও রাখবে আবার ভাঙ্গবেও। তিনি বললেন, তারপর আরেকদিন তার স্ত্রী পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধি মাখা অবস্থায় এলেন যেন নববধু।"[৩৬]

---

৩৫ আব্দুর রাজ্জাক, *আল-মুসান্নাফ*, অধ্যায়: আল-নিকাহ, অনুচ্ছেদ: আল-কাওলু 'ইনদাল জিমা'আ ওয়া কাইফা ইয়াসনা'উ ওয়া ফাযলুল জিমা'আ, বৈরূত: আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১৪০৩ হি. পৃ. ১৮৫৫
عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليْه و سلم قَالَ: " إِذَا غَشِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَلْيَصْدِقْهَا، فَإِنْ قَضَى حَاجَتَهُ، ولَمْ تَقْض حَاجَتَهَا فلا يُعَجِّلْهَا "

৩৬ আবূ হাতিম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান, *সহীহ ইবনে হিব্বান*, অধ্যায়: আল-বির ওয়াল ইহসান, পরিচ্ছেদ : মা যাআ ফিত তা'আত ওয়া সাওয়াবিহা, বৈরূত: মুয়াস্‌সাতুর-রিসালাহ, ১৯৯৩, পৃ. ১৩১
عَنْ أبِي مُوسَى، قَالَ: دَخَلَتِ امْرَأةُ عُثْمَانَ بْن مَظْعُونٍ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليْه و سلم فَرَأَيْنَهَا سَيِّئَةَ الْهَيْئَةِ، فَقُلْنَ: مَا لَكِ، مَا فِي قُرَيْشٍ رَجُلٌ أَغْنَى مِنْ بَعْلِكِ، قَالَتْ: مَا لَنَا مِنْهُ شَيْءٌ؟ أَمَّا نَهَارُهُ فَصَائِمٌ، وَأَمَّا لَيْلُهُ فَقَائِمٌ، قَالَ: فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليْه و سلم فَذَكَرْنَ ذَلِكَ لَهُ، فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليْه و سلم فَقَالَ: " يَا عُثْمَانُ، أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ "؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي؟ قَالَ: " أَمَّا أَنْتَ فَتَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ "، قَالَ: فَأَتَتْهُمُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَطِرَةً كَأَنَّهَا عَرُوسٌ، فَقُلْنَ لَهَا: مَهْ، قَالَتْ: أَصَابَنَا مَا أَصَابَ النَّاسَ

আবু জুহাইফা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. সালমান এবং আবু দারদা রা. এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। সালমান রা. আবু দারদা রা. এর সাক্ষাতে গেলেন। তিনি উম্মে দারদা রা. কে ময়লা কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং তাকে তার ঐ অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, 'আপনার ভাই আবূ দারদার দুনিয়ার চাহিদা নেই।' এর মধ্যে আবূ দারদা এলেন এবং তার (সালমানের) জন্য খাবার তৈরি করলেন এবং বললেন : খাবার গ্রহণ কর, কারণ আমি রোযা আছি। সালমান রা. বললেন, 'তুমি না খেলে আমি খাচ্ছি না।' কাজেই আবূ দারদা রা. খেলেন। যখন রাত হল, আবূ দারদা রা. উঠে পড়লেন। সালমান রা. বললেন, 'ঘুমাও'; তিনি ঘুমালেন। পুনরায় আবূ দারদা উঠলে সালমান রা. বললেন, 'ঘুমাও।' রাতের শেষ দিকে সালমান রা. তাকে বললেন, 'এখন ওঠো।' কাজেই তারা উভয়ে নামায পড়লেন এবং সালমান রা. আবূ দারদা রা. কে বললেন, 'তোমার উপর তোমার রবের অধিকার রয়েছে; তোমার উপর তোমার আত্মার অধিকার রয়েছে, তোমার উপর তোমার পরিবারের অধিকার রয়েছে; কাজেই প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা উচিত।' পরে আবূ দারদা রা. রসূলুল্লাহ স. এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং একথা তাঁর কাছে উল্লেখ করলেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, 'সালমান যথার্থই বলেছে।'[৩৭]

বাস্তবেই ইসলাম নারী ও পুরুষের যৌন জীবনকে পারিবারিক বন্ধনের সীমারেখায় সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধাপূর্ণ করতে নির্দেশনা প্রদান করে। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "আমি কি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে তোমাদের বলব? তারা হচ্ছে : স্নেহপরায়ণ, অধিক সন্তান প্রসবকারিনী এবং স্বামীদের প্রতি বিনম্র সংবেদনশীল, যারা যখন কষ্ট পায় বা কষ্ট দেয়, স্বামীর নিকট এসে হাত ধরে এবং বলে, আল্লাহর শপথ! তোমার প্রফুল্লচিত্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি কোন কিছুর স্বাদ নেব না।"[৩৮]

---

৩৭ ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-জুহদ, পরিচ্ছেদ: মা যাআ ফি হিফযিল লিসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯৩
عَنْ عَوْن بن أبي جُحَيْفَةَ، عَنْ أبيه، قَالَ: " آخَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليْه و سلم بَيْنَ سَلْمَانَ وَبَيْنَ أبِي الدَّرْدَاء فزَارَ سَلْمَانُ أبَا الدَّرْدَاء فرَأى أمَّ الدَّرْدَاء مُتَبَذّلة، فقَالَ: مَا شَأنُكِ مُتَبَذّلة؟ قَالَتْ: إنَّ أخَاكَ أبَا الدَّرْدَاء لَيْسَ لَهُ حَاجَة فِي الدُّنْيَا، قَالَ: فلمَّا جَاءَ أبُو الدَّرْدَاء قَرَّبَ إليْهِ طَعَامًا، فقَالَ: كُلْ فإنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأكُلَ، قَالَ: فأكَلَ، فلمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أبُو الدَّرْدَاءِ لِيَقُومَ، فقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: نَمْ، فنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فقَالَ لَهُ: نَمْ، فنَامَ، فلمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ قَالَ لَهُ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ فقَامَا فصَلَّيَا، فقَالَ: " إنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإنَّ لِأهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ "

৩৮ ইমাম নাসাঈ, *আস-সুনান আল-কুবরা*, অধ্যায়: 'ইসতিন নিসা, পরিচ্ছেদ: আল-মুলা'ইবাতি, বৈরূত: দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯১, পৃ. ২৫০৫
عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليْه و سلم: " ألا أخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أهْلِ الجَنَّةِ ؟ الوَدُودُ، الوَلُودُ، العَئُودُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إذَا آذَتْ، أوْ أوذِيَتْ، جَاءَتْ حَتَّى تَأخُذَ بِيَدِ زَوْجِهَا، ثُمَّ تَقُولُ: وَاللهِ لا أذُوقُ غُمْضًا حَتَّى تَرْضَى "

বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধকরণ

ইসলাম নারী-পুরুষের বিবাহপূর্ব দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আল্লাহ্ বলেন, "সে যে স্ত্রীলোকের ঘরে ছিল সে তার কাছ থেকে অসৎকাজ কামনা করল ও দরজাগুলো বন্ধ করে দিল এবং বলল, 'আস।' সে বলল, 'আমি আল্লাহ্র অশ্রয় প্রার্থনা করছি, তিনি আমার প্রভু; তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় সীমালজ্ঘনকারীরা সফলকাম হয় না। সে নারী তো তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন দেখতে পেত। আমি তাকে মন্দ-কাজ ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়ে ছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত"।[৩৯]

বস্তুতই যুগে যুগে বিকৃত চিন্তা-চেতনার অনুসারী কিছু সংখ্যক লোক শয়তানের প্ররোচণায় নানা রকম অসামাজিক, অশ্লীল এবং পাশবিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে সমাজকে ধ্বংস করে দিয়েছে। বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্কও তেমনি একটি ঘৃণিত অশ্লীল অপরাধ। কুরআনে বলা হয়েছে "হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দকাজের আদেশ করবে। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন, শোনেন।"[৪০] সমাজ-সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সকল প্রকার মন্দ, দোষণীয়, অশ্লীল ও অশালীনতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য ইসলাম মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছে।

ইসলামে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মাঝে বিবাহের প্রস্তাবদান ও তা গ্রহণ করার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কাজেই বিবাহের আগে সামান্য সম্পর্ক রাখাও বৈধ নয়। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "আমি যখন কোন একজন যুবক ও যুবতীকে নির্জনে একত্র যদি দেখি তখন আমি বিশ্বাস করি না যে, শয়তান তাদের

---

[৩৯] আল-কুরআন, ১২:২৩-২৪
وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ○ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

[৪০] আল-কুরআন, ২৪:২১
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

প্ররোচনা দেয় না ।"[৪১] কাজেই শুধু এনগেজমেন্টের কারণেও তারা পরস্পর নির্জনে মিলিত হতে পারে না। কেননা পরস্পর মেলামেশা, অপ্রয়োজনীয় দেখা সাক্ষাৎ কিংবা কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে অনৈতিক ভাব সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহ বলেন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বাক্যালাপ কর না, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়।"[৪২] কাজেই শুধু এনগেজমেন্ট হওয়ার কারণে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে গণ্য তো হয় না অথচ এমতাবস্থায় কখনো কখনো তাদের মাঝে অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ব্যভিচার নিষিদ্ধকরণ

ইসলাম অশ্লীল কাজ হিসেবে ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "ব্যভিচারিণী নারী এবং ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর।"[৪৩] আল্লাহ লজ্জাস্থান হিফাজতকারীকে ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী; আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারী নারী তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।"[৪৪] তাই আল্লাহ ব্যভিচারকে শুধু নিষিদ্ধই করেননি; বরং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, "ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।"[৪৫] রসূলুল্লাহ স. বলেন, "সাত প্রকার লোককে আল্লাহ তায়ালা (কিয়ামতের দিন) তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন। সেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না। (সেই সাত শ্রেণীর একজন হল) যে ব্যক্তিকে কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সুন্দরী রমণী ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান জানায় আর ঐ ব্যক্তি শুধু আল্লাহর ভয়ে তা থেকে বিরত থাকে।"[৪৬] সুতরাং যৌনসঙ্গমরত কোন স্থিরচিত্র ও ভিডিও দেখাও

---

৪১ ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, অধ্যায়: আল-অসায়া, পরিচ্ছেদ: জিমা'উ আবওয়াবিত তারগীব ফিন নিকাহ, বাবু তাখসিসিল ওয়াজহি ওয়াল কাফ্ফাইন বি যাওয়াযিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৮০
رَأيتُ شَابًا وَشَابَةً فلمْ آمَن الشَّيْطانَ عَلَيْهِمَا "

৪২ আল-কুরআন, ৩৩ : ৩২
إن اتَّقيْتُنَّ فلا تَخْضَعْنَ بِالقوْل فيَطمَعَ الذِي فِي قلبهِ مَرَضٌ وَقلنَ قوْلا مَّعْرُوفا

৪৩ আল-কুরআন, ২৪ : ২ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

৪৪ আল-কুরআন, ৩৩:৩৫
وَالحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أعَدَّ اللهُ لهُم مَّغفِرَةً وَأجْرًا عَظِيمًا

৪৫ আল-কুরআন, ১৭:৩২ وَلا تَقرَبُوا الزِّنَى إنَّهُ كَانَ فاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا

৪৬ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-যাকাত, পরিচ্ছেদ: ফাদলু ইখফাইস সাদাকাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪৮

ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার গুনাহের মতো। পর্ণোগ্রাফি ছবি বা অশ্লীল সিনেমা দেখাও ব্যভিচারের সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় নিষিদ্ধ। কেননা রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, চোখের যিনা দৃষ্টি দেখা, কানের যিনা শ্রবণ করা, মুখের যিনা কথা বলা, হাতের যিনা স্পর্শ করা, পায়ের যিনা পথ চলা।"[৪৭] চোখের মাধ্যমে ব্যক্তি নারীর সৌন্দর্য ও রূপ উপভোগ করে। পরবর্তীতে এরূপ কাজের প্রতি অন্তরে ভাবের সৃষ্টি হয়। আর এ পথ ধরেই শুরু হয় অশ্লীলতা। ড. মুজাম্মিল সিদ্দিকী বলেন, "পর্ণোগ্রাফিক সিনেমা দেখা, এরূপ গান শুনা কিংবা গাওয়া, কারও হাত-পা এরূপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা এসব কাজই এমন অপরাধ যা ব্যভিচার-সংশ্লিষ্ট এবং ব্যভিচারের চূড়ান্ত কাজটি এসবের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়।"[৪৮] সুতরাং পর্ণোগ্রাফি ওয়েবসাইট ব্রাউজিং করাও নিষিদ্ধ। কেননা মুসলিমদের সর্বসময় দৃষ্টি অবনত করার আদেশ করা হয়েছে যেন সে অন্য কারো গোপন অঙ্গ দেখা থেকে বিরত থাকে।

সমকামিতা নিষিদ্ধকরণ

ব্যভিচারের আরেকটি বিকৃত রূপ হচ্ছে সমকামিতা। মানব সভ্যতার উন্নয়নে সমকামিতা এক বড় অন্তরায়। কুরআন এবং হাদীসের নানা স্থানে সমকামিতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কুরআনের সাত জায়গায় লূত আ. এর জাতির কথা বলা হয়েছে, যাদেরকে সমকামিতার অপরাধের জন্য আলাহ ধ্বংস করে দেন।[৪৯] আল্লাহ বলেন, "আমি লূতকে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ "

[৪৭] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, অধ্যায়: মুসনাদুল 'আশারাহ আল-মুবাশিশরীনা বিল জান্নাহ- মুসনাদু আবি হুরাইরা রা., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: " لِكُلِّ بَنِي آدَمَ حَظٌّ مِنَ الزِّنَا، فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، وَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي، وَزِنَاهُ الْقُبَلُ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ "

[৪৮] Dr. Muzammil Siddiqi, "This means that watching pornographic movies, listening to such songs or singing them, using one's hands and feet for this purpose, all these are sins that are related to Zina and then the final act of Zina takes place through haram intercourse." http://www.soundvision.com/Info/life/porn/isporn.asp, accessed on 15th March 2012.

[৪৯] সূরা আল-আরাফের ৮০-৮৪ আয়াত, সূরা হুদ এর ৭১-৮৩ আয়াত, সূরা আল-আম্বিয়া এর ৭৪ আয়াত, সূরা আল-হাজ্জ্ব এর ৪৩ আয়াত, সূরা আশ-শুয়ারা এর ১৬৫-১৭৫ আয়াত, সূরা আন-নামল এর ৫৬-৫৯ আয়াত, সূরা আনকাবুত এর ২৭-৩৩ আয়াত

প্রেরণ করেছি। যখন সে তার জাতিকে বলল, 'তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি। তোমরা তো তৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদের কাছে গমন কর, তোমরা তো সীমালঙ্ঘন করছ।"[৫০] "তোমরা নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে যৌন কামনা পূর্ণ করছ? তোমরা তো মূর্খ সম্প্রদায়।"[৫১] পবিত্র কুরআনে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, "নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না। প্রকাশ্যে হোক কিংবা অপ্রকাশ্যে।"[৫২]

'সমকামিতা' যে মারাত্মক ধরনের সীমালঙ্ঘন এবং অশ্লীল কাজ তা পবিত্র কুরআনের (৭:৮০, ৮১) এবং (২৬:১৬৬) নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। সে সাথে এই ধরনের কুকর্মের সাথে জড়িতদের (২৯:৩০) নং আয়াতে ফাসাদ সৃষ্টিকারী অর্থাৎ দুস্কৃতিকারী এবং (২৯:৩১) নং আয়াতে জালিম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই 'সমকামিতাকে' ব্যভিচারের সাথে সম্পৃক্ত না করে সন্ত্রাস বা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কারণগুলোর সাথে বিবেচনা করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

ইসলামী চিন্তাবিদগণ রসূলুল্লাহ স. এর হাদীস ও সীরাত থেকে সমকামিতার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ডের বিধান দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ স. কয়েকটি হাদীসে সমকামিতাকে অভিশাপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং দু'জনের জন্য মৃত্যুদন্ডের শাস্তি ঘোষণা দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ স. বলেন, "কোথাও তুমি মানুষদেরকে লূতের জাতির মত পাপ করতে দেখলে তাকে হত্যা করবে। যে এটা করে এবং যে এটাতে সাহায্য করে দুই জনকেই হত্যা করো।"[৫৩] ইমামগণ সমকামিতার শাস্তি বর্ণনায় বিভিন্ন মত উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ মুসলিম দেশে সমকামিতাকে অপরাধ হিসেবে দেখা হয় এবং শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। সৌদি আরব, ইরান, মৌরিতানিয়া, উত্তর নাইজেরিয়া, সুদান, ইয়েমেনে সমকামিতার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। আফগানিস্তানে সমকামিতার শাস্তি জেল ও অর্থদন্ডে নামিয়ে আনা হয়েছে। ইউনাইটেড আরব আমিরাত ও বাংলাদেশে সমকামিতার বিরুদ্ধে আইন স্পষ্ট নয়। অনেক মুসলিম দেশ যেমন বাহরাইন, কাতার, আলজেরিয়া, উজবেকিস্তান ও মালদ্বীপে সমকামিতার শাস্তি হিসেবে জেল, অর্থদন্ড ও শারীরিক শাস্তি দেয়া হয়। মিশরে সমকামিতার বিরুদ্ধে কোন আইন নেই। কিন্তু সমকামিতা সেখানে বৈধ নয়। এর জন্য শাস্তি হিসেবে জেল-জরিমানা রাখা হয়েছে।

---

৫০ আল-কুরআন, ৭ : ৮১ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

৫১ আল-কুরআন, ২৭ : ৫৫ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

৫২ আল-কুরআন, ৬ : ১৫১ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

৫৩ ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-হুদূদ, পরিচ্ছেদ: মান 'আমিলা 'আমলা কাওমি লূত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৭
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: " مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ "

নারী-পুরুষের গোপনাঙ্গ দেখা নিষিদ্ধকরণ

পোশাক পরিধান করা মানব সভ্যতার পরিচায়ক। আল্লাহর শত্রু শয়তান আদম আ. ও হাওয়া আ. কে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘনে প্রলুব্ধ করে উভয়কে বিবস্ত্র করার মাধ্যমে তাদের গোপনীয়তা প্রকাশ করে দিয়েছিল। আল্লাহ বলেন, "হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদের আবার ঠিক তেমনিভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ না করে যেমনভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল এবং তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের কাছে উন্মুক্ত করে দেবার জন্য তাদেরকে বিবস্ত্র করেছিল। সে ও তার সাথীরা তোমাদেরকে এমন জায়গা থেকে দেখে যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। এ শয়তানদেরকে আমি যারা ঈমান আনে না তাদের অভিভাবক করে দিয়েছি।"[৫৪] পবিত্র কুরআনের নারী-পুরুষ উভয়কে পোশাক পরিধানের শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি সাজসজ্জার বস্তু হিসেবে এবং তাকওয়ার পোশাক-এটি সর্বোত্তম।"[৫৫] নারী-পুরুষের পোশাকের ক্ষেত্রে শালীন ও মার্জিত পোশাকই তাকওয়ার পোশাক। আল-কুরআনের সূরা আন-নূর ও সূরা আল-আহযাবে মুসলিম নারীদের জাহেলি যুগের ন্যায় নিজেদের রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শন করে বাইরে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় চাদর দিয়ে নিজেদের দেহকে আবৃত করে রাখতে বলা হয়েছে। এ সব আদেশের ক্ষেত্রে নারীদের ঘরে আটকে রাখার কথা বলা হয়নি; বরং তাদের সৌন্দর্য আবৃত করে রাখার কথা বলা হয়েছে। ঘরের বাইরে পুরুষদেরও নগ্ন হওয়ার জাহেলী নিয়ম-কানূন নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

নারী ও পুরুষ উভয়কেই নিজেদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। সূরা আন-নূরের ৩০ নম্বর আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, "দৃষ্টি নত রাখার অর্থ দৃষ্টিকে এমন বস্তু থেকে ফিরিয়ে নেয়া যার প্রতি দেখা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ"।[৫৬] ইবনে কাসীর এবং ইবনে হাইয়ান এ তাফসীরই করেছেন। নারীর প্রতি

---

[৫৪] আল-কুরআন, ৭:২৭

يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ

[৫৫] আল-কুরআন, ৭:২৬

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ

[৫৬] আল-হুসাইন ইবনে মাসউদ আল-বাগাবী, *মা'আলিমুত-তানযীল*, আল-কুরআন: ২৪:৩০ এর তাফসীর, বৈরূত: দারুল-মা'রেফা, ১৯৮৭, খ. ৪, পৃ. ৩৩

قوله - عز وجل - : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) أي : عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه . وقيل : " من " صلة أي : يغضوا أبصارهم . وقيل : هو ثابت لأن المؤمنين غير مأمورين بغض البصر أصلا لأنه لا يجب الغض عما يحل النظر إليه ، وإنما أمروا بأن يغضوا عما لا يحل النظر إليه ، (ويحفظوا فروجهم) عما لا يحل ، قال أبو العالية :

দৃষ্টি নিষিদ্ধ। কোন নারী অথবা পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দেখাও এর অন্তর্ভুক্ত। তবে অবশ্যই চিকিৎসা ইত্যাদির কারণে প্রয়োজনীয় অঙ্গ দেখা ব্যতিক্রম। এছাড়া কারো গোপন তথ্য জানার জন্য তার গৃহে উঁকি মেরে দেখা এর অন্তর্ভুক্ত। যৌনাঙ্গ সংযত রাখার অর্থ কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যত পন্থা আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এ আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্মধ্যে কাম প্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার।[৫৭] রসূলুল্লাহ স. বলেন, "দুই চোখ ব্যভিচার করে। চোখের ব্যভিচার হচ্ছে দেখা।"[৫৮] এ দু'টিকে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করে হারাম করে দেয়া হয়েছে। এতদুভয়ের অর্ন্তবর্তী-ভূমিকাসমূহ যেমন কথাবার্তা শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

যে নারী স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে পোশাক ছেড়ে অনাবৃত হয়ে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে সে মূলত আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন "কোন নারী বাড়িতে স্বামী ব্যতীত অন্য কারো সামনে পোশাক-পরিচ্ছদ ছেড়ে অনাবৃত হয়ে কাউকে তার সৌন্দর্য প্রদর্শন করলে সে যেন আল্লাহ ও তার মধ্যকার বন্ধন পর্দাকে ভেঙ্গে ফেলল।"[৫৯] এর মাধ্যমে মূলত স্ত্রী স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গের দায়ে দোষী হয়ে নিজেকে অপমানিত করে। ফলে আল্লাহও তাকে লজ্জিত ও অপমান করবেন। এমন নারী আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "দুই শ্রেণীর দোযখবাসীকে আমি এখনও দেখিনি, তাদের এক শ্রেণীর হাতে গরুর লেজের মত লাঠি থাকবে এবং তা দিয়ে মানুষকে প্রহার করবে এবং ঐ সব স্ত্রীলোক যারা পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ থাকে। পর-পুরুষকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করবে। তাদের মাথা বড় উটের মাথার মত

كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا والحرام ، إلا في هذا الموضع فإنه أراد به الاستتار حتى لا يقع بصر الغير عليه ، (ذلك) أي : غض البصر وحفظ الفرج ، (أزكى لهم) اي : خير لهم واطهر ،

৫৭ সংক্ষেপিত: *ইবনে কাসীর*, *তাফসীরুল কুরআনুল আযীম*, মিশর: মু'আসসাসাহ করডোবা, ২০০০, খ. ১০, পৃ. ২১২-২১৭

৫৮ ইবনুল জাওযী, *যাম্মুল হাওয়া*, অধ্যায়: আয-যাম্মুল হাওয়া, পরিচ্ছেদ: আস-সালিস আশারা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: " العَيْنَانُ تَزْنِيَان، وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ "

৫৯ ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: মা যাআ ফি দুখুলিল হাম্মাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩২
عَنْ أبي المَلِيحِ الهُذَلِيِّ، أنَّ نِسَاءً مِنْ أهْلِ حِمْصَ، أوْ مِنْ أهْلِ الشَّام دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: أنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الحَمَّامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُولُ: " مَا مِنَ امْرَأةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إلا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا "

হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার ঘ্রাণও পাবে না।"[৬০] কারণ তারা তাদের দেহের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে যুব সামাজের যৌন অনুভূতিতে এমন এক সুড়সুড়ি তৈরি করে, যা একপ্রকার যৌন প্রতারণা।

নারী-পুরুষের উগ্র চালচলন সমাজে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করে। ফলে নারীদেরকে সুগন্ধি মেখে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসে উল্লেখ আছে, "প্রত্যেক চোখ যিনা করে। মেয়েলোক যখন সুগন্ধি মেখে কোন বৈঠকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, সেও যিনাকারিণী।"[৬১] যে নারী অনিয়ন্ত্রিত নগ্ন জীবন যাপন করে, সে শুধু নিজের সর্বনাশই করে না, তার চালচলনের প্রভাব তার ভবিষ্যৎ বংশধরের ওপরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই পড়ে। ইসলাম জাহিলী যুগেও অন্যান্য জাতির নারীদের এ নগ্নপণাকে মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।[৬২]

একইভাবে তা পুরুষের বেলায়ও প্রযোজ্য। পুরুষকে তার গুপ্তাঙ্গ সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে। আসহাবে সুফ্ফার সদস্য যারহাদ রা. বর্ণনা করেন, "রসূলুল্লাহ্ স. আমাদের সামনে বসা ছিলেন তখন আমার উরু উন্মুক্ত ছিল। তিনি বলেন, তুমি কি জান না যে উরুও গোপন অঙ্গ।"[৬৩] মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ্ বলেন, আমি একটি ভারী পাথর

---

[৬০] ইমাম মুসলিম, *সহীহ্ মুসলিম*, অধ্যায়: আল-লিবাস ওয়ায যিনাহ্, পরিচ্ছেদ: আন-নিসা আল-কাসিয়াত আল-আরিআত আল-মাইলাত আল-মুমীলাত, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৪, পৃ. ১১৪
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم: " صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَطُّ: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاَتٌ مُمِيلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَمْثَالِ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا

[৬১] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-আদব, পরিচ্ছেদ: মা যাআ ফি কারাহিয়্যাতি খুরুযিল মারআ মুআত্তারাহ্, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২৮
عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ: " كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً "

[৬২] ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-হাম্মাম, পরিচ্ছেদ: আদ-দুখুল ফিল হাম্মাম, সিরিয়া: দারুল-ফিকর, তা. বি., পৃ. ১০৭৯
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: " إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرِ وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ "

[৬৩] ইমাম দারেমী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-ইসতিযান, পরিচ্ছেদ: ফি আন্নাল ফাখযা 'আওরাহ্, বৈরূত: দারুল-কুতুব আল-আরাবী, ১৪০৭, পৃ. ৬১৩
عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ جَرْهَدٌ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم عِنْدَنَا وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ، فَقَالَ: " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ "

বহন করে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে আমার কাপড় পড়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমার কাপড় ধর, নগ্ন হয়ে পথ চলবে না।"[৬৪]

পুরুষের সতর নাভী হতে হাটু পর্যন্ত। তবে গোসলের সময় পুরুষরা উল্লেখিত অঙ্গ খোলা রাখতে পারে । তবে পর্দার আড়ালে গোসল করা উত্তম। ইয়ালা ইবনে মুররা রা. বলেন, একদা রসূলুল্লাহ স. খোলা স্থানে এক ব্যক্তিকে গোসল করতে দেখলেন। তিনি এই দৃশ্য দেখে মসজিদের মিম্বারে উঠে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাশীল ও পর্দাকারী। তিনি লজ্জা ও পর্দা করাকে ভালবাসেন। অতএব যখন তোমাদের কেউ গোসল করে, তখন সে যেন পর্দা করে।"[৬৫]

বাহয ইবনে হাকীম রা. থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের লজ্জাস্থান কতটুকু ঢেকে রাখব এবং কতটুকু খোলা রাখতে পারব? তিনি বলেন, "তোমার স্ত্রী এবং তোমার দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন নারীরা ব্যতীত সবার দৃষ্টি থেকে তোমার গোপনাঙ্গকে সংরক্ষণ করবে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, পুরুষ লোকেরা একত্রে অবস্থানরত থাকলে? তিনি বলেন, যতদূর সম্ভব কেউ যেন তোমার আবরণীয় স্থান না দেখতে পারে তুমি তাই কর। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, মানুষতো কখনো নির্জন অবস্থায়ও থাকে। তিনি বললেন, আল্লাহ তো লজ্জা করার ক্ষেত্রে বেশি অধিকারী।"[৬৬]

আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "আল্লাহ বলেছেন, দৃষ্টিপাত শয়তানের একটি শর। যে ব্যক্তি মনের চাহিদা সত্ত্বেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আমি তার পরিবর্তে তাকে সুদৃঢ় ঈমান দান করব, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব

---

৬৪ ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-হাম্মম, পরিচ্ছেদ: মা যাআ ফিত তা'আররুয়ি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮১

عَنْ المِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ، قَالَ: حَمَلتُ حَجَرًا ثَقِيلا، فَبَيْنَا أمْشِي، فسَقَط عَنِّي ثَوْبِي فقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم: " خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً "

৬৫ ইমাম নাসাঈ, *আস-সুনান আস-ছুগরা, অধ্যায়: আল-গুসল ওয়াত তায়াম্মুম, অনুচ্ছেদ: আল-ইসতিতার 'ইনদাল ইগতিসাল, বৈরূত: দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪, পৃ. ১০৪*

عَنْ يَعْلى: انَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم رَأى رَجُلا يَغْتَسِلُ بِالبَرَازِ بِلا إزَار، فصَعَدَ المِنْبَرَ، فحَمِدَ اللهَ وَأثنى عَليْهِ، ثمَّ قالَ صلى الله عليه و سلم: " إنَّ اللهَ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فإذا اغْتَسَلَ أحَدُكُمْ، فليَسْتَتِرْ "

৬৬ ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-আদাব, অনুচ্ছেদ: বাবু মা যাআ ফি হিফযিল আওরাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২৩

بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ: " احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ "، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إذَا كَانَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: " إن اسْتَطَعْتَ أنْ لَا يَرَاهَا أحَدٌ فَلَا يَرَاهَا "، قَالَ: قُلتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إذَا كَانَ أحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: " فَاللهُ أحَقُّ أنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ "

করবে। রসূলুলাহ স. বলেন, "হঠাৎ কোন পর নারীর প্রতি দৃষ্টি পতিত হলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।[৬৭] আলী রা. এর হাদীসে আছে, প্রথম দৃষ্টি মাফ এবং দ্বিতীয় দৃষ্টি গোনাহ।[৬৮] এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রথম দৃষ্টিপাত অকস্মাৎ ও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে ক্ষমার্হ। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতও ক্ষমার যোগ্য নয়। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "কোন পুরুষ অপর কোন পুরুষের গুপ্তাঙ্গ এবং কোন নারী অপর কোন নারীর গুপ্তাঙ্গ দেখবে না। কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ অন্য পুরুষের ও কোন নারী অপর কোন নারীর সাথে এক কাপড়ে শয়ন করবে না।"[৬৯] তাছাড়া কোন নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষা দিতে অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ স. কোন ব্যক্তির একান্ত পারিবারিক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। রসূলুল্লাহ স. বলেন, 'কেউ যদি তোমার গৃহে অনুমতি ব্যতীত হঠাৎ করে উপস্থিত হয় তবে তুমি যদি তাকে কোন পাথর নিক্ষেপ কর; যাতে তার চোখ দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলে। এতে তার কোন অপরাধ হবে না"।[৭০]

অশ্লীলতা প্রতিরোধে মদ নিষিদ্ধকরণ

মদ মানুষের মৃত্যুসহ বিশ্ব জুড়ে কোটি কোটি মানুষের ভয়ঙ্কর দুর্দশার কারণ। সমাজের অসংখ্য সমস্যার নেপথ্যে রয়েছে মদ। অপরাধ প্রবণতার তীব্র উর্ধগতি, ক্রমবর্ধমান মানসিক বিপর্যয় এবং সংসার ভাঙ্গনের জীবন্ত প্রমাণ বহন করছে। কুরআনে মদ পানের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, পাশা

---

৬৭ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: বাবু নাযরিল ফাযাআহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১০
عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِصلى الله عليْه و سلم عَنْ نَظْرَةِ الْفَجَاءَةِ " فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي

৬৮ ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-আদাব, অনুচ্ছেদ: মা যাআ ফি হিফযিল আওরাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২৫
عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، رَفَعَهُ قَالَ: " يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ "

৬৯ ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: কিতাবুল হাম্মাম, পরিচ্ছেদ: মা যাআ ফিত তা'আরুয়ি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮১
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليْه و سلم قَالَ: " لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ "

৭০ ইমাম তাবারানী, *আল-মু'জাম*, অধ্যায়: রিওআয়াতুহু আনিল মাক্কিয়ীন, পরিচ্ছেদ: গুআইবুন আন আবিয যিনাদ আবদিল্লাহ, বৈরূত: মুআসসাহতুর-রিসালাহ, ১৯৮৪, পৃ. ১০১০
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليْه و سلم: " لَوِ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِكَ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ "

খেলা ও তীর ছুড়ে ভাগ্য জানা এগুলো শয়তানের নিকৃষ্ট ধরনের জঘন্য কারসাজি। এসব পরিহার কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৭১] মানুষ যখন মদ পান করে, তখন তার বিবেকবোধ স্থবির হয়ে পড়ে। মদের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "মদ সকল মন্দ ও অশ্লীলতার উৎস এবং যাবতীয় মন্দের মধ্যে ওটা সর্বনিকৃষ্ট।"[৭২] আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "মদের সাথে জড়িত এমন দশ শ্রেণীর লোকদের ওপরে আল্লাহর অভিশাপ। তারা হলো, (১) যারা তা তৈরী করে, (২) যাদের জন্য তা বানানো হয়, (৩) যারা তা পান করে, (৪) যারা তা বহন করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যায়, (৫) যাদের জন্য তা নিয়ে আসা হয়, (৬) যারা তা পরিবেশন করে, (৭) যারা তা বিক্রি করে, (৮) যারা তা বিক্রি লব্ধ টাকা ব্যবহার করে, (৯) যারা তা কেনে এবং (১০) যারা অন্য আর একজনের জন্য তা কেনে"।[৭৩]

অশ্লীলতা প্রতিরোধে পর্দার ব্যবস্থাপনা

পর্দাহীনতা আর নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা সমাজে কেমন বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এবং নারীকে কীভাবে ভোগ্য-পণ্যের বস্তুতে পরিণত করেছে তা চারদিকে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাওয়া যায়। পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, দাম্পত্য-কলহ ও পারস্পরিক অবিশ্বাস, বিবাহ-বিচ্ছেদ, নারী-নির্যাতন ইত্যাদি সবকিছুর পেছনেই একটি প্রধান কারণ হলো পর্দাহীনতা এবং নর-নারীর অবাধ মেলা-মেশা। আল্লাহ নারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং জাহেলিয়াত যুগের নারীদের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করে অশ্লীলভাবে ঘোরাফেরা কর না।"[৭৪] আল্লাহ পুরুষ এবং নারীদেরকে সমবেতভাবে পর্দার আদেশ দিয়ে বলেন, "মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা

---

[৭১] আল-কুরআন, ৫:৯০
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[৭২] ইমাম দারু কুতনী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-আশরিবাহ ওয়া গাইরিহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৫
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم: " الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ "

[৭৩] আবূ আব্দুল্লাহ আন-নিশাপুরী, *আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সাহিহাইন*, অধ্যায়: আল-আত'ইমা, পরিচ্ছেদ: ইন্নাল্লাহ লা'আনাল খামারা ওয়া শারিবিহা, বৈরূত: দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি. পৃ.৮১৫
ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم يَقُولُ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَمُسْتَقِيَهَا "

[৭৪] আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৩ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গকে হিফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[৭৫]

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে শুধু পরস্পরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিতেই বারণ করেনি; অধিকন্তু সকল প্রকারের দৈহিক সংস্পর্শ থেকেও বিরত থাকতে নির্দেশ প্রদান করেছে। ইসলাম মনে করে, দুর্ঘটনা ঘটার আগে তার পথগুলো বন্ধ করাই শ্রেয়। কিছু সংখ্যক লোক ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থাকে সমালোচনা করে এবং এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিম নারীদের উপরে একপ্রকার এমন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে বলে মনে করে, যার ফলে তারা মানবীয় কার্যাদিতে ইচ্ছামত অংশগ্রহণ করতে পারে না বলে মনে করে অথচ এ ধারণা সঠিক নয়। ইসলাম পর্দাপ্রথার মাধ্যমে নারী জাতিকে মর্যাদা ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে এবং তাঁকে এমন এক নিরাপত্তা দান করেছে, যার ফলে একজন নারী অধিকতর স্বাচ্ছন্দের সাথে তার কাজকর্মসমূহ সমাধা করতে পারে। তাই পর্দা মুসলিম নারীকে প্রশান্তি দান করেছে।

তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

বর্তমান যুগে বিশেষত পাশ্চাত্য-বিশ্বে নারীকে তাঁর নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা রূপে আখ্যায়িত করা হয়। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সাথে তাল-মিলিয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের তুলনায় অধিকতর যোগ্য বলেও চিহ্নিত করা হচ্ছে। এটা কোন কোন ক্ষেত্রে হতেও পারে। অর্থনৈতিক চাকচিক্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আধুনিক বিশ্বের নারীদের ভোগ্য পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। অন্যদিকে

---

[৭৫] আল-কুরআন, ২৪:৩০-৩১

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

প্রযুক্তিগত উন্নতির আড়ালে নারীকে কেন্দ্র করে পর্ণোগ্রাফি তৈরি করে বিভিন্ন দেশে পর্ণোগ্রাফির বিপুল চাহিদা তৈরি করছে। পর্ণো বাণিজ্যের সম্প্রসারণ লক্ষ্যে পৌঁছুতে ইতোমধ্যে এর পিছনে অত্যন্ত শক্তিশালী অর্থনীতি সৃষ্টি করেছে। সারা বিশ্বের দেশে দেশে পর্ণোগ্রাফি থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয় হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বে প্রতি সেকেন্ডে তিন হাজার ডলার যা বাংলাদেশী টাকায় প্রায় আড়াই লাখ টাকারও বেশি- পর্ণোগ্রাফির পেছনে ব্যয় হচ্ছে। এ থেকেই বুঝা যায় যে পর্ণো ইন্ডাস্ট্রি বিশ্ব অর্থনীতিতে কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। পর্ণোশিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা ২০০৬ সালে চীনে ২৭.৪০ বিলিয়ন ডলার আয় করেছেন, যদিও পর্ণোগ্রাফির উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও বিপণন চীনে আইনত নিষিদ্ধ। ২০০৬ সালে পর্ণোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা দক্ষিণ কোরিয়ায় ২৫.৭৩ বিলিয়ন ডলার, জাপানে ১৯.৯৪ বিলিয়ন ডলার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৩.৩৩ বিলিয়ন ডলার আয় করেছেন।[৭৬] নারী-স্বাধীনতার নামে নারীকে যথেচ্ছভাবে বিজ্ঞাপন-সামগ্রী এবং পর্ণোগ্রাফিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারী যেন একটি অপরিহার্য অনুসঙ্গ।[৭৭] নানামুখী তৎপরতা ও মিথস্ক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী কিছুটা অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলেও পাশ্চাত্যের সমাজ-ব্যবস্থাসহ পৃথিবীব্যাপী নারী এক ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন। নারী-নির্যাতন, শিশুহত্যা, পতিতাবৃত্তি, ধর্ষণ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, লিভটুগেদার, মাদকাসক্তি, কুমারী-মাতৃত্ব ইত্যাদি সমস্যা পাশ্চাত্য-সমাজে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে পর্ণোগ্রাফি তৈরি ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ করে 'পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২' শিরোনামে প্রণয়ন সময়োচিত সিদ্ধান্ত। আইনটি প্রণয়নের প্রাসঙ্গিকতা হিসেবে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ বলে উল্লেখ করা হয়। পর্ণোগ্রাফি প্রদর্শনের ফলে নৈতিক

---

৭৬ শেখ হাফিজুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের উদ্যোগটি ভালো, তবে...* দৈনিক প্রথম আলো, তারিখঃ ০৮-০১-২০১২

৭৭ দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭, সম্প্রতি দি ওয়াশিংটন পোষ্ট পত্রিকার বরাত দিয়ে আমাদের ঢাকার দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, "আমেরিকার মেয়েরা যৌন-আবেদনময়ী হওয়ার পরিবেশেই বড় হচ্ছে। তাদের সামনে যেসব পণ্য ও ছবি তুলে ধরা হচ্ছে তাতে তারা যৌনতার দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে। মার্কিন সংস্কৃতি, বিশেষ করে প্রধান প্রধান প্রচার-মাধ্যমে মহিলা ও তরুণীদের যৌন-ভোগ্য-পণ্য হিসেবে দেখানো হচ্ছে। আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল এসোসিয়েশন (এপিএ) টাস্ক ফোর্স অন দ্যা সেক্সুয়ালাইজেশন অব গার্লস-এর সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে একথা বলা হয়। রিপোর্টের প্রণেতাগণ বলেন, টিভি-শো থেকে ম্যাগাজিন এবং মিউজিক-ভিডিও থেকে ইন্টারনেট পর্যন্ত প্রতিটি প্রচার-মাধ্যমেই এই চিত্রই দেখা যায়। .... প্রণেতাদের মতে, যৌনরূপদান তরুনী ও মহিলাদের তিনটি অতি সাধারণ মানসিকস্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো হলো পেটের গোলযোগ, আত্মসম্মানহানিবোধ এবং মনমরা ভাব। .... লিজ গুয়া নামের একজন মহিলা বলেন, তিনি তাঁর ৮ (আট) বছরের মেয়ে তানিয়ার উপযোগী পোশাক খুঁজে পেতে অসুবিধায় রয়েছেন। প্রায়ই সেগুলো খুবই আঁটসাঁট, নয়তো খুবই খাটো। যৌন-আবেদন ফুটিয়ে তোলার জন্যই এ ধরনের পোশাক তৈরি করা হয়।"

ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে; বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে; সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেননা বর্তমানে চলচ্চিত্র, স্যাটেলাইট, ওয়েবসাইট ও মোবাইলের মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফি মারাত্মক ব্যাধির মত দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। নারী, পুরুষ, শিশু ও যুব সমাজকে সামাজিকভাবে সুরক্ষা দেয়ার বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আইনটি প্রণয়নের প্রাসঙ্গিকতায় প্রকৃতার্থে ইসলামের শাশ্বত নৈতিকতার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে।

ইসলামী মূল্যবোধ মানুষকে অশ্লীল কর্ম থেকে বিরত রাখে। অশ্লীলতার সকল দুয়ার উন্মুক্ত রেখে শুধু আইন করে অশ্লীলতাকে রোধ করা যায় না। পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মননে ধর্মীয় মূল্যবোধ অভাবনীয় প্রভাব ফেলতে পারে। একমাত্র ইসলামী জীবন দর্শনের বাস্তবায়ন পর্ণোগ্রাফি নামক মহামারি থেকে সমাজকে রক্ষা করতে পারে। বিশেষ করে ইসলামী মূল্যবোধ মানুষকে সকল প্রকার অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখতে পারে।

সুপারিশমালা

এক. পর্ণোগ্রাফি আয়ের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বছরে প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করা হয় পর্ণোগ্রাফি বিজনেসের মাধ্যমে। এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী একে মানবাধিকার বলে আখ্যা দেয়া শুরু করেছে। এদের কাছে অশ্লীলতা বলতে কিছু নেই। অন্যদিকে বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় পর্দা উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

দুই. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে পর্ণোগ্রাফি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) চাইলেই ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে ইন্টারনেটে পর্ণোগ্রাফি রোধ করতে পারে। সব সাইবার ক্যাফেতে নজরদারি বৃদ্ধি এবং তাদের মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফি প্রচার ও প্রসার বন্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করা উচিত।

তিন. শুধু আইনই যথেষ্ট নয়; বরং আইনের যথাযথ প্রয়োগও জরুরী। আইনের প্রয়োগ করতে পারলেই কেবল পর্ণোগ্রাফি ও এ সংক্রান্ত সকল অনাচার দূর করা সম্ভব হবে।

চার. পর্ণোওয়েবসাইটগুলোর মাধ্যমে একাধিক সংঘবদ্ধ চক্র নানা ধরনের সাইবার ক্রাইম করছে। পর্ণোগ্রাফি রোধে সুনির্দিষ্ট আইনের অবর্তমানে পর্ণোগ্রাফির ওয়েবসাইটগুলো বন্ধ বা দমন করা যায়নি এবং এর জন্যে শাস্তিও দেয়া যায়নি। উক্ত আইনের মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফির ওয়েবসাইটগুলো বন্ধ করার ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পাচ. বর্তমানে পর্ণোগ্রাফির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানি করা হয়। এ ক্ষেত্রে যৌন হয়রানীমুক্ত শিক্ষা ও কর্মপরিবেশ তৈরিতে মহামান্য হাইকোর্ট প্রদত্ত নীতিমালা প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। সরকারি-বেসরকারি সকল কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার বৈষম্য, যৌন হয়রানী এবং নির্যাতন দমন এবং নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টিতে নিয়োগদাতা বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সচেতন হতে হবে।

ছয়. নিজ ইচ্ছায় ঐ দৃশ্যে যারা অবৈধ পারফর্ম করে তাদের কোন শাস্তির আওতায় আনা হয়নি। আইনে উল্লেখিত বিভিন্ন শাস্তির আওতায় তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

সাত. বাংলাদেশে পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন নতুন। ফলে এ আইনের অপপ্রয়োগের আশঙ্কাও থেকে যায়। অবশ্য এ আইনে কেউ মিথ্যা তথ্য দিয়ে মামলা দিলেও তা প্রমাণ হলে তার শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। আইনের সুযোগ নিয়ে কোনভাবেই তা যেন কারো উপর অপপ্রয়োগ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য।

আট. কেউ কেউ বিশেষ সুবিধার লোভে পড়ে নিজের অজান্তে এ ভুল পথে পরিচালিত হয়। ফলে পর্ণোগ্রাফিতে যৌনকর্মে তাদের এমন সম্মতি ফুঠে উঠে বাস্তবে যা সঠিক নয়। এক্ষেত্রেও এ কাজকে ধর্ষণ হিসেবে আমলে নিয়ে শাস্তি প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।[৭৮]

---

[৭৮] এডভোকেট সিরাজ প্রামাণিক, লেখক : সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী, আইন ভাবনা : পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২ ও প্রাসঙ্গিক কথা, *আজকালের খবর*, ২ ফেব্রুয়ারী-২০১২ (তিনি লিখেছেন, আমাদের মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট সোহেল রানা বনাম রাষ্ট্র মামলায় (৫৭ ডিএলআরের ৫৯১ পৃষ্ঠায়) বলেছেন, যৌনকর্মের সময় যদি ভিকটিম বাধা না দেয় অথবা বাধা দেয়ার চেষ্টা না করে অথবা কোনো চিৎকার না দেয় তাহলে তাতে ভিকটিমের সম্মতি আছে ধরে নিতে হবে। ২৭ আগস্ট-২০০৯ তারিখে ধর্ষণের অভিযোগে আনীত একটি মামলায় আসামি হান্নানকে আদালত খালাস দেন। আদালত বলেন, ওই মামলার ঘটনায় ভিকটিম রুনা খাতুন (১৬) (ছদ্মনাম উল্লেখ করেন) প্রতিবেশী আসামি হান্নান তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে প্রায় ছয়-সাত মাস ধরে তাদের বাড়িতে অন্যদের অনুপস্থিতিতে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে বেশ কয়েকবার যৌনকর্মে মিলিত হয়। যার ফলে ভিকটিম রুনা খাতুন গর্ভবতী হয়। গর্ভবতী হওয়ার পাঁচ মাস পর ভিকটিম তার মাকে জানায় এবং এ ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদে একটি সালিশও হয়। আসামি হান্নান ভিকটিম রুনা খাতুনকে বিয়ে করতে অস্বীকার করায় চেয়ারম্যান, মেম্বার ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির সিদ্ধান্তে আসামিকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। এ মামলায় বিচারক আসামিকে খালাস দেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ঘটনার সময় ভিকটিমের বয়স কমপক্ষে ১৬ বছর ছিল। এর আগে তার দু'বার বিয়ে হয়েছিল এবং আসামির সঙ্গে তার

নয়. সিনেমা, টিভি বিজ্ঞাপন ও নাটক অশ্লীলতামুক্ত করতে হবে। অশ্লীল সংলাপ, অশ্লীল গান, প্রেমের আবেদন, পরকীয়া ইত্যাদির উপাদান খুঁজে বের করা প্রয়োজন। চরিত্র বিধ্বংসী সর্বপ্রকার বস্তুই নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিনোদন কেন্দ্র, নাটক, সিনেমা, টিভি বিজ্ঞাপনসহ সকল অঙ্গনকে অশ্লীলতামুক্ত রাখতে আইনে উল্লেখিত নৈতিক মূল্যবোধের সুরক্ষা দিতে হবে।[৭৯]

দশ. আইনটি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। কমিটিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, মানবধিকার কর্মী ও স্থানীয় আলিমদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

এগার. বাংলাদেশে ভাসমান কিছু নারী ও শিশু অবৈধ যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী এদেরকে ব্যবহার করে অবৈধ পর্ণো ছবি উৎপাদন করে। ফলে এদের পুনর্বাসন সেবা, বিশেষ শিক্ষা, চাকরির প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের সুযোগসহ প্রয়োজনীয় সহায়তাদান প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পদক্ষেপ নেয়া অত্যাবশ্যক।

বার. সমাজের সভ্যসাচি মানুষদের বিনোদন প্রয়োজন মিটাতে দেশে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ লাভ করেছে। আর এ সুযোগে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যক্তিবর্গ অশ্লীল ছবি নির্মাণ করে সুস্থ ধারার চলচ্চিত্রের সর্বজন গ্রহণযোগ্যাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে। এ ক্ষেত্রে শর্ত ও নিয়মভঙ্গের উপযুক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে 'দি সেন্সরশিপ অব ফিল্ম এক্ট' এ উল্লেখিত আইনের ধারা অনুযায়ী 'অনুমোদিত ছবির প্রত্যায়ন বাতিলকরণ' সিদ্ধান্ত কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।[৮০]

একাধিকবার যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়া ভিকটিমের সম্মতিরই নামান্তর। এ ধরনের অনাচার আমাদের সমাজে হরহামেশা দেখা যায়। এহেন প্রতারণা করেও এসব ক্ষেত্রে প্রেমিকেরা পার পেয়ে যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে প্রেমিকাদের অবশ্যই বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।)
http://www.ajkalerkhabarbd.com/pages/details/2012/02/02/33536

[৭৯] *THE CODE FOR CENSORSHIP OF FILMS IN BANGLADESH, 1985* (Dhaka, the 16th November 1985 No. S.R.O.478-L/ 85.) [Immorality or Obscenity: N.B.- (4) In case a picture creates such an impression on the audience as to encourage vice or immorality, even it shows that the vicious to the immoral has been punished for his/her wrong.

[৮০] *THE CENSORSHIP OF FILMS ACT, 1963.* Act No. XVIII of 1963 (As amended by President's Order No. 41 of 1972, Ordinance No. LV111 of 1982 and Act No. 1 of 2006), aviv 7 [Power to decertify certified films- 7. Where the Government is of the opinion that a

তের. বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এখানকার অধিবাসী জনগোষ্ঠীর নৈতিকতা দেশের আইনসমূহকেও দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। 'দি কোড ফর সেন্সরশিপ অব ফিল্মস ইন বাংলাদেশ, ১৯৮৫' তে ' Religious Susceptibilities অর্থাৎ 'ধর্মীয় সংবেদনশীলতা' এবং Immorality or Obscenity অর্থাৎ 'অনৈতিকতা বা অশ্লীলতা' দু'টি শিরোনামে যথাক্রমে চারটি ও পাঁচটি ক্ষেত্র বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখিত ক্ষেত্রসমূহে পর্ণোগ্রাফির যাবতীয় অশ্লীলতাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উপমহাদেশের প্রযোজিত সিনেমা মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধিকরণে এ শর্তসমূহ মাইলফলক।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ পর্ণোগ্রাফি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও প্রদর্শনীকে কখনোই অনুমোদন করেনি। এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনাদর্শ ইসলাম পর্ণোগ্রাফিসহ সব ধরনের অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ফলে এ অঞ্চলের মুসলিমরা ছিল যাবতীয় অশ্লীলতামুক্ত ও রুচিহীন ক্রিয়াকর্মের বিপরীতে উন্নত জীবন যাপনের প্রতি

---

certified film, or class of certified films, should, in the interest of law and order, or in the interest of local film industry, or in any other national interest, be decertified in respect of the whole or any part of Bangladesh, it may, of its own motion, by notification in the official Gazette, direct that such film or class of films shall be deemed to be uncertified film or films in respect of the whole of Bangladesh, or such area or areas as may be specified in the notification.], 7A (1), (2) & (3) [Seizure of film 7A. (1) Where the Board has reason to believe that a film or publicity materials are being exhibited in any place in contravention of any provision of this Act or any rule made thereunder, it may, by order in writing, authorise any Police Officer not below the rank of Sub-Inspector or any District Information Officer to search the place and seize the film and the publicity materials, if any, of that film. (2) A Police Officer or District Information Officer who has seized a film or any publicity materials under sub-section (1) shall forthwith forward it to the Court. (3) On receipt of a film or any publicity materials under sub-section (2) the Board] shall take such action under the Act as it deems proper.]

প্রত্যয়শীল। তাদের শিল্প, সাহিত্য, নাটক, সিনেমাসহ সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা এ উন্নত তাহযীব-তামাদ্দুনের পক্ষেই স্বাক্ষর বহন করে। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় স্যাটেলাইট, মোবাইল প্রযুক্তি, ইন্টারনেট, সাইবার ক্যাফে ইত্যাদি উদ্ভাবনের পর নৈতিকতা বিরোধী যে অশ্লীল ভিডিও ও স্থিরচিত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে তা নিয়ন্ত্রণে সুস্পষ্ট আইনগত পদক্ষেপ হিসেবে সরকার নতুন আইন প্রণয়ন করে। প্রস্তাবিত আইনে পর্ণোগ্রাফি সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা সম্পর্কে প্রদত্ত বিবৃতি ও মূল আইনের শিরোনাম পরবর্তী উল্লেখিত আইন প্রণয়নের প্রেক্ষাপট বর্ণনায় আইনটির যে প্রাসঙ্গিকতা ফুটে উঠেছে তা পক্ষান্তরে অশ্লীলতা নিয়ন্ত্রণে ইসলামী নৈতিকতার ঐতিহাসিক ও উন্নত পদক্ষেপসমূহের তাৎপর্যই বহন করছে। ইসলাম মানব জীবন পরিচালনায় একটি ভারসাম্যপূর্ণ নৈতিক চরিত্রে বিকশিত শাশ্বত আদর্শ। পর্ণোগ্রাফির মতো একটি অনৈতিক কর্ম ইসলামী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ জাতির ভেতর কখনই সৃষ্টি হতে পারে না। বাংলাদেশে পর্ণোগ্রাফি ও সংশ্লিষ্ট অপরাধ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও জীবন-নির্ধারণের সঠিক ও পূর্ণ অনুসরণ।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮ সংখ্যা-৩২
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১২

সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা

শাহাদাৎ হুসাইন খান*

[সারসংক্ষেপ : সন্ত্রাস বর্তমান সময়ের সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতার সাথে প্রতিযোগিতা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে সন্ত্রাস। সন্ত্রাস একদিকে যেমন বিশ্ব শান্তিকে হুমকির মুখে দাঁড় করে দিয়েছে অন্যদিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে সভ্যতার সৌধকে। বর্তমান বিশ্বে ইসলামকে সন্ত্রাসের সাথে একাকার করে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। অথচ মানবসভ্যতার শুরুতেই সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত নিয়ে ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা সন্ত্রাসের সাথে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে, এর দ্বারা ইসলামপ্রিয় জনগোষ্ঠিকে আতঙ্কিত করে তোলা হচ্ছে এবং বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হচ্ছে। অত্র প্রবন্ধে সন্ত্রাস এর সংজ্ঞা, কুরআন ও হাদীসে সন্ত্রাস প্রসঙ্গ, সন্ত্রাস প্রতিরোধে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা ও মহানবী স. এর কার্যক্রম বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।]

সন্ত্রাস এর সংজ্ঞা

সন্ত্রাসের একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ বর্তমান মতবিরোধপূর্ণ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একপ্রকার অসম্ভবই বটে। কারণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠির দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা যে কোন বিষয় বা মতবাদের সংজ্ঞার ভিন্নতা নির্দেশ করে। তাই তো দেখা যায়, এক গোষ্ঠির দৃষ্টিতে যে কর্মকাণ্ড সন্ত্রাসের মতো নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত কর্ম, অপর গোষ্ঠির দৃষ্টিতে সে কর্মকাণ্ডই স্বাধীনতা কিংবা স্বাধিকার আদায় সংগ্রামের মতো মহৎ ও প্রশংসনীয় কর্ম। সন্ত্রাসের সংজ্ঞায়নে বিতর্ক থাকলেও বক্ষ্যমাণ আলোচনার উদ্দেশ্য অর্জনের প্রয়োজনে সন্ত্রাসের একটি সুনির্দিষ্ট পরিচয় নির্ধারণ আবশ্যক।

সন্ত্রাস শব্দটি বাংলা 'ত্রাস' শব্দ থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ ভয়, ভীতি, শঙ্কা।[১] আর সন্ত্রাস অর্থ হলো, মহাশঙ্কা, অতিশয় ভয়, [২] কোনো উদ্দেশ্যে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি

---

* শিক্ষার্থী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ৫৭৩

২. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ৫৪১

করার প্রচেষ্টা, অতিশয় শঙ্কা বা ভীতি, [৩] অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ,[৪] ভীতিজনক অবস্থা, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পরিবেশ।[৫] সন্ত্রাস এর সমার্থক শব্দ হিসাবে সন্ত্রাসবাদ, আতঙ্কবাদ, বিভীষিকাপন্থা, সহিংস আন্দোলন, উগ্রপন্থা, উগ্রবাদ, চরমপন্থা ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়।[৬] বর্তমানে সন্ত্রাস কোন বিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ড নয়। বর্তমানে এটি একটি মতবাদে পরিণত হয়েছে। তাই সন্ত্রাস ভিত্তিক বা কেন্দ্রিক মতবাদ ও কর্মকাণ্ডকে বুঝাতে সন্ত্রাসবাদ শব্দটি বহুল প্রচলিত। অভিধানে "সন্ত্রাসবাদ" অর্থ লেখা হয়েছে যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য হত্যা অত্যাচার ইত্যাদি কার্য অনুষ্ঠাননীতি,[৭] রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পীড়ন, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক কর্ম অবলম্বন করা উচিত- এই মত।[৮] ইংরেজীতে সন্ত্রাস অর্থ বুঝাতে Terror : great fear/alarm, terrorism[9] extreme fear, the use of organized intimidation terrorism [based on Latin terrere Òto frighten"][১০] শব্দসমূহ ব্যবহৃত হয়।

আধুনিক আরবি ভাষায় সন্ত্রাস শব্দের প্রতিশব্দ হলো الإرهاب (ইরহাব)।[১১] এ শব্দটি এসেছে رهب থেকে যার অর্থ خاف বা ভীত হলো, ভয় পেলো ইত্যাদি।[১২] আর إرهاب অর্থ হলো تخويف (তাখভীফ) ও تفزيع (তাফযী)[১৩] তথা ভীতিপ্রদর্শন, শঙ্কিতকরণ, আতঙ্কিতকরণ।[১৪] সন্ত্রাস এর শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থের ব্যাপারে মতানৈক্য তেমন না থাকলেও এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নির্ধারণে যথেষ্ট মতানৈক্য

---

৩. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১৩
৪. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাঙালা অভিধান*, কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০, পৃ. ৮০৪
৫. রিয়াজ আহমদ, *ব্যবহারিক শব্দকোষ*, ঢাকা : সাহিত্য বিলাস, ২০০৮, পৃ. ২৬২
৬. অশোক মুখোপাধ্যায়, *সংসদ সমার্থ শব্দকোষ*, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৮, পৃ. ২৪৭
৭. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১৩
৮. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৪
৯. Mohammad Ali and others, *Bangla Academy Bangali-English Dictionary*, Dhaka : Bangla Academy, 1994, p. 786
১০. *Illustrated OXFORD DICTIONARY*, London : Dorling kindersley Limited, 2006. p. 859
১১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৭১
১২. ইবনে মানযুর আল-আফরীকী আল-মিসরী, *লিসানুল আরব*, বৈরূতঃ দারু সাদির, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৪৩৬
১৩. ইবরাহীম মুসতাফা ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, বৈরূত : দারুদ দা'ওয়াহ, তা.বি.,খ. ১, পৃ. ৩৭৬; আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ, বৈরূত : দারুল মাশারিক, ১৯৯৪, পৃ. ২৮২
১৪. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ . ২৬৪, ৩০৩

পরিলক্ষিত হয়। আর এই মতানৈক্যের কারণেই আজ পর্যন্ত সন্ত্রাস এর সর্বসম্মত কোন পারিভাষিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক Global terrorism এর উপর প্রকাশিত annual review 2000 এ বলা হয়েছে যে, "no one defination of terrorism has gained universal acceptance" অর্থাৎ সন্ত্রাসের কোন সংজ্ঞা সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি।[১৫] প্রত্যেক মতবাদীরাই নিজ নিজ বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছে। ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র, দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ সন্ত্রাসের সংজ্ঞায়নে চেষ্টা অব্যহত রেখেছে। বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাস কেন্দ্রিক আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে দুইটি প্রধান দর্শন। একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীদের সমন্বয়ে গঠিত পাশ্চাত্য দর্শন। অপরটি ইসলামী দর্শন। তাই সন্ত্রাস এর সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ উভয় দর্শন থেকে প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহ উল্লেখ করা হলো।

১. যায়েদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে হাদী আল-মাদখালী বলেন,

إن الإرهاب كلمة لها معنى ذو صور متعددة يجمعها الإخافة والترويع للآمنين بدون حق وإزهاق الأنفس البريئة وإتلاف الأموال المعصومة وهتك الأعراض المصونة

'ইরহাব (সন্ত্রাস) এমন একটি শব্দ বিভিন্ন আঙ্গিকে যার অনেক অর্থ রয়েছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে- নিরপরাধ, অন্যায়ভাবে নির্দোষ মানুষকে ভয় দেখানো ও শঙ্কিত করা। কখনো নিরীহ ব্যক্তিবর্গকে হত্যার সীমাহীন ভীতি প্রদর্শন, সুরক্ষিত সম্পদ বিনষ্ট বা লুট, সতী-সাধ্বী নারীর সম্ভ্রমহানি করা।'[১৬]

২. আল–মাওসূ'আহ আল–আরাবিয়্যাহ আল–'আলামিয়্যাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে,

الإرهاب : استخدام العنف أو التهديد به لإثارة الرعب

"ইরহাব (সন্ত্রাস) হচ্ছে ভীতি সঞ্চারের জন্য বল প্রয়োগ করা অথবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করা।"[১৭]

৩. 'রাবিত্বাতুল আলামিল ইসলামী' পরিচালিত 'ইসলামী ফিক্বহ কাউন্সিল' ১৪২২ হিজরীতে মক্কায় অনুষ্ঠিত ১৬তম অধিবেশনে সন্ত্রাসের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ করে,

---

১৫. *The Guardian*, Date : 7 May, 2001. http://www.guardian.co.uk/world/2001/may/07/terrorism.

১৬. প্রফেসর ফাহাদ ইবনে ইবরাহীম আবুল উসারা, *লামহাত 'আনিলি ইরহাবি ফিল আসরিল হাযির*, সউদী আরব : জামি'আহ আল–ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ আল–ইসলামিয়্যাহ, ২০০৪, পৃ. ৫

১৭. আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ, *আল-ইরহাব আসবাবুহু ওয়া ওসায়িলুল ইলাজ*, *মাজাল্লাতুল বুহুছ আল–ইসলামিয়্যাহ*, সউদী আরব : কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা, ২০০৩, সংখ্যা–৭০, পৃ.১০৮-১০৯

العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان (دينه ، وعقله ، وماله ، وعرضه) ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق ، وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق ، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، ويهدف إلي إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم ، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر ، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة ، أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر ، فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عنها

"কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র কোন মানুষের ধর্ম, বুদ্ধিমত্তা, সম্পদ ও সম্মানের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যে শত্রুতার চর্চা করে তাকে সন্ত্রাস বলে"। এ সংজ্ঞাটি সব ধরনের নীতিবহির্ভূত ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন, ক্ষতিসাধন, অন্যায় ও বিচার বহির্ভূত হত্যা, অপরাধমূলক হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে একক ও সমষ্টিগতভাবে পরিচালিত যে কোন ধরনের অন্যায় কর্ম, সশস্ত্র হামলা, চলাচলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, রাহাজানি, ভীতিকর ও হুমকিপূর্ণ কাজ এবং লোকজনের জীবন, স্বাধীনতা, নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে, জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে এমন কর্মকাণ্ডকে শামিল করে। তাছাড়া পরিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি, ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট বা প্রাকৃতিক সম্পদকে ধ্বংস করাও সন্ত্রাস হিসাবে গণ্য হবে।'[১৮]

৪. ১৯৮৯ সালে আরব দেশসমূহের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ প্রদত্ত সংজ্ঞা হচ্ছে-

هو كل فعل منظم من أفعال العنف، أو التهديد به يسبب رعباً، أو فزعاً من خلال أعمال القتل، أو الاغتيال، أو حجز الرهائن، أو اختطاف الطائرات، أو السفن، أو تفجير المفرقعات أو غيرها من الأفعال مما يخلق حالة من الرعب والفوضى, والاضطراب الذي يستهدف أهدافاً سياسية

"সহিংসতা সৃষ্টিকারী বা হুমকি-ধমকি প্রদানকারী এমন সব কাজ যা দ্বারা মানবমনে ভীতি-আতঙ্ক, ভয় ও ত্রাস সৃষ্টি হয়। তা হত্যাকাণ্ড, ছিনতাই, অপহরণ, গুপ্তহত্যা, পণবন্দী, বিমান ও নৌজাহাজ ছিনতাই বা বোমা বিস্ফোরণ প্রভৃতির যে কোনটির মাধ্যমে হোক না কেন। এছাড়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংঘটিত যেসব কাজ ভীতিকর অবস্থা ও পরিবেশ, নৈরাজ্য, বিশৃংখলা ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে (তাও সন্ত্রাস)"।[১৯]

৫. Britannica READY REFERENCE ENCYCLOPEDIA তে সন্ত্রাস-এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, Terrorism the systematic use of

---

[১৮]. প্রফেসর ফাহাদ ইবনে ইবরাহীম আবুল উসারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

[১৯]. ড. আব্দুর রহমান ইবনে মু'আল্লা আল-লুয়াইহিক, *আল-ইরহাব ওয়াল-গুলু*, জামি'আহ আল-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ আল-ইসলামিয়্যাহ, ২০০৪, পৃ. ১৩

violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective.[২০]

"একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনগণের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করার সুসংগঠিত পন্থাই হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ"।

৬. মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা FBI সন্ত্রাসকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে, The unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives. (28 C.F.R. Section 0.85)[২১]

অর্থাৎ-সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কোন সরকার, বেসরকারি জনগণ বা অন্য যে কোন অংশকে ভীতি প্রদর্শন বা দমনের জন্য ব্যক্তিবর্গ বা সম্পদের উপর অবৈধ শক্তি প্রয়োগ বা সহিংস ব্যবহারকে সন্ত্রাস বলা হয়।

যে কর্মকাণ্ড সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি, জান-মালের ক্ষতি সাধন, দেশ ও সমাজে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি, শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন, স্থাপনা ও স্থাপত্য ধ্বংস এবং সর্বস্তরের নাগরিকদের আতঙ্কিত করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হুমকির সম্মুখীন করে তাকে বলা হয় সন্ত্রাস। মোটকথা যে কর্মকাণ্ড জনগণের মাঝে ভয়-ভীতি ও আতংকের সৃষ্টি করে এবং জানমালের ক্ষতি সাধন করে তাই সন্ত্রাস এবং যে বা যারা এসকল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তারাই সন্ত্রাসী।

কুরআনে সন্ত্রাস প্রসঙ্গ

ইসলামী আইনের প্রধান উৎস আল-কুরআনুল কারীমে সন্ত্রাস প্রসঙ্গ দুই ভাবে এসেছে : শাব্দিক অর্থে ও পারিভাষিক অর্থে। সন্ত্রাস–এর আরবী প্রতিশব্দ 'ইরহাব' (إرهاب) কে ভিত্তি ধরে শাব্দিক অর্থ হলো-

প্রথমত : আল্লাহকে ভয় করা অর্থে এর শব্দমূলের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন : আল্লাহ বলেন : "মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হলো তখন সে ফলকগুলো তুলে নিলো। যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য তাতে যা লিখিত ছিল তার মধ্যে ছিল পথনির্দেশ ও রহমত।"[২২] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন : "হে বনী

---

২০. *Britannica READY REFERENCE ENCYCLOPEDIA*, New Delhi : Encyclopedia Britannica (India) Pvt . Ltd and Impulse Marketing, (Special edition for south Asia, 2005, Volume – 9, p. 223

২১. *www.fbi.gov/stats-services/publications/terrorism-2002-2005*

২২. আল-কুরআন, ৭ : ১৫৪ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ

ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর যা দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।"[২৩] আল্লাহ অপর এক আয়াতে উল্লেখ আছে, "আল্লাহ বললেন, তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ কর না; তিনিই তো একমাত্র ইলাহ। সুতরাং আমাকেই ভয় কর"।[২৪]

দ্বিতীয়ত : মানুষকে ভয় দেখানো বা সন্ত্রস্ত করা অর্থেও ইরহাব (إرهاب) শব্দের সরাসরি ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন : "তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত্র করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এ ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।"[২৫]

সামান্য পরিবর্তিত ফর্মে (Form) শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ অন্যত্র বলেন :"সে (মূসা) বলল, তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তারা (যাদুকররা রজ্জু ও লাঠি) নিক্ষেপ করল তখন তারা লোকের চোখে জাদু করল, তাদেরকে আতংকিত করল এবং তারা এক রকমের জাদু দেখালো।"[২৬]

প্রচলিত অর্থে সন্ত্রাস বলতে যা বুঝায় তা প্রকাশের জন্য ইরহাব (إرهاب) শব্দের ব্যবহার কুরআনে পাওয়া যায় না। সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী কার্যক্রম বুঝানোর জন্য কুরআনে 'ফিতনাহ' (فتنة) এবং 'ফাসাদ' (فساد)শব্দদ্বয়ের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত সীরাত বিষয়ক উর্দু বিশ্বকোষ 'নুকুশ' এর বর্ণনা নিম্নরূপ; "পবিত্র কুরআন গভীরভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু, ঈমান, কায়-কারবার ইত্যাদি যার কারণে হুমকি ও বিপর্যয়ের মুখে পতিত হয় তা-ই হলো 'ফিতনা' এবং যার কারণে মানুষের জীবনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, তা-ই হলো 'ফাসাদ'।"[২৭]

---

২৩. আল-কুরআন, ২ : ৪০ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

২৪. আল-কুরআন, ১৬ : ৫১ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

২৫. আল-কুরআন, ৮ : ৬০ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

২৬. আল-কুরআন, ৭ : ১১৬ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

২৭. মোঃ মুখলেছুর রহামান, *সন্ত্রাস নয়, শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম*, ঢাকা :এন আরবি গ্রুপ, ২০১১, পৃ. ১৫

আল-কুরআনে 'ফিতনা' প্রসঙ্গ

আল–কুরআনে 'ফিতনা' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেসব আয়াতে 'ফিতনা' কে সন্ত্রাসের কাছাকাছি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. আল্লাহকে অস্বীকার করা, তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করা, ইবাদতে বাধা প্রদান ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ফিতনার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ বলেন, "পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে। বল, তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্র পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে (প্রবেশে) বাধা দেয়া এবং তার বাসিন্দাকে তা হতে বহিস্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায় ; ফিতনা (দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, নির্যাতন) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়।"[২৮]

২. দুর্বলের উপর অত্যাচার করা, তাদের ন্যায্য অধিকার হরণ করা, তাদের ঘর–বাড়ি জবরদখল করা এবং তাদের বিভিন্ন পন্থায় কষ্ট দেয়াও ফিতনার আওতাভুক্ত। আল্লাহ্ বলেন : "যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, অতঃপর জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, তোমার প্রতিপালক এসবের পর, তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"।[২৯]

৩. জবরদস্তিমূলক সত্যকে দমন করা এবং সত্যগ্রহণ থেকে মানুষকে বাধা দেয়া। আল্লাহ্ বলেন : "ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গ নির্যাতন করবে এই আশংকায় মূসার সম্প্রদায়ের এক দল ব্যতীত আর কেউ তাঁর প্রতি ঈমান আনে নাই। বস্তুত ফির'আওন ছিল দেশে পরাক্রমশালী এবং সে অবশ্যই সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"[৩০]

৪. মানুষকে বিভ্রান্ত করা, বিপথে চালিত করা এবং সত্যের বিরুদ্ধে প্রতারণা, ধোঁকা, বিশ্বাসঘাতকতা ও বল প্রয়োগের চেষ্টা করা। আল্লাহ্ বলেন : "আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা হতে তারা পদস্খলন ঘটানোর চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত

---

২৮. আল-কুরআন, ২:২১৭ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

২৯. আল-কুরআন, ১৬:১১০ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم

৩০. আল-কুরআন, ১০: ৮৩ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين

করেছিল যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে তার বিপরীত মিথ্যা উদ্ভাবন কর; তবেই তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো"।[৩১]

৫. বিশ্বাসীদের বিপদে ফেলা। আল্লাহ বলেন :"যারা বিশ্বাসী নর-নারীদেরকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবা করেনি তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রণা"।[৩২]

৬. অসত্যের প্রতিষ্ঠা, অসৎ ও অবৈধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধ, হত্যা ও রক্তপাত করা। আল্লাহ বলেন : "যদি বিভিন্ন দিক হতে তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের প্রবেশ ঘটত, অতঃপর তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করা হতো, তবে তারা অবশ্য তাই করত, তারা এতে কালবিলম্ব করত না।"[৩৩]

আল–কুরআনুল কারীমে 'ফাসাদ' শব্দটি বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যে সব আয়াতে 'ফাসাদ' শব্দকে সন্ত্রাসের কাছাকাছি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. অন্যায় শাসন ও হত্যাকাণ্ড, দুর্বলদের প্রতি অবিচার ও সম্পদ লুটপাট করা। আল-কুরআনে আল্লাহ ফির'আউনকে 'ফাসাদ' সৃষ্টিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ সে তার প্রজাদের মাঝে শ্রেণী ও বর্ণগত পার্থক্য সৃষ্টি করতো এবং স্বৈরাচারী শাসন চালাতো, দুর্বলদের ও বিরোধীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করতো এবং তাদের সম্পদ লুট করতো।

আল্লাহ বলেন : "ফিরআউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল ; তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।"[৩৪]

২. ন্যায়ানুগ পন্থার বিপরীতে বিকৃত পথে জীবন চালানো। প্রাচীনকালের আদ, সামুদ, লুত, মাদায়েনবাসীসহ বিভিন্ন জাতিকে আল–কুরআনে আল্লাহ ফাসাদকারী হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ তারা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠভাবে জীবন–যাপনের পরিবর্তে বিকৃত পথে জীবনকে চালিত করেছিল।

---

৩১. আল-কুরআন, ১৭:৭৩ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا

৩২. আল-কুরআন, ৮৫:১০ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق

৩৩. আল-কুরআন, ৩৩:১৪ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا

৩৪. আল-কুরআন, ২৮:৪ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين

আল্লাহ্ বলেন: "যারা দেশে সীমালংঙ্ঘন করেছিল এবং সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল।"[৩৫]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন : "তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছ, তোমরাই তো রাহাজানি করে থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কাজ করে থাক। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এই বলল, আমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি আনয়ন কর-যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"[৩৬]

৩. আগ্রাসনের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়। সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের ফলে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় তাও ফাসাদ।

আল্লাহ্ বলেন : "সে বলল, রাজা–বাদশাহ্রা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অপদস্থ করে, এরাও এরূপই করবে।"[৩৭]

অন্য স্থানে আল্লাহ্ বলেন, "আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সৎকর্ম করত না।"[৩৮]

৪. জুলুম,অবিচার ও লুটতরাজের কাজে প্রশাসনিক ক্ষমতার ব্যবহার করা। যে ধরনের শাসন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ক্ষমতাকে মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের পরিবর্তে জুলুম, অবিচার ও লুটতরাজের কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে আল–কুরআন 'ফাসাদ' নামে অভিহিত করেছে।

আল্লাহ্ বলেন : "যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু নিপাতের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ্ অশান্তি পছন্দ করেন না।"[৩৯]

৫. সন্ত্রাসের মাধ্যমে যারা সমাজে অশান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায় আল–কুরআন তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ্ বলেন :"যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন

---

৩৫. আল-কুরআন, ৮৯ :১১–১২ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ

৩৬. আল-কুরআন, ২৯:২৯ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

৩৭. আল-কুরআন ২৭:৩৪ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

৩৮. আল-কুরআন, ২৭ : ৪৮ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

৩৯. আল-কুরআন, ২ : ২০৫ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"[৪০]

৬. অন্যায়ভাবে বা পৃথিবীতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করার শামিল। আল্লাহ বলেন : "এই কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করার কারণ ব্যতীত কেউ কাউকেও হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল।"[৪১]

৭. পৃথিবীতে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের শাস্তি ও পরিণতি প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন : "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় এটা তাদের শাস্তি যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।"[৪২]

হাদীসে সন্ত্রাস প্রসঙ্গ

ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস আল-হাদীসে সন্ত্রাস শব্দটি সরাসরি ব্যবহৃত না হলেও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক বুঝাতে বেশ কিছু পরিভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সেসব পরিভাষার অন্যতম হলো, আল-কত্‌লু (القَتْلُ) বা হত্যা, আয-যুল্‌ম (الظلم) বা অত্যাচার, আত-তারভী, (الترويع) বا ভয় প্রদর্শন, হামলুছ ছিলাহ (حمل السلاح) বা অস্ত্র বহন করা, আল-ইশারাতু বিছ-ছিলাহ (الإشارة بالسلاح) বা অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করা ইত্যাদি। তবে এসব পরিভাষা ছাড়াও বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ডকে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাস প্রসঙ্গ বুঝাতে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার কয়েকটি নিম্নে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হলো।

---

৪০. আল-কুরআন, ২ : ২৭ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

৪১. আল-কুরআন, ৫ : ৩২ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

৪২. আল-কুরআন, ৫ : ৩৩
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

১. একে অপরের প্রতি অত্যাচার করা নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন : "হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার জন্য অত্যাচারকে হারাম করেছি এবং তা তোমাদের জন্যও হারাম করে দিয়েছি। সুতারাং তোমরা পরস্পর অত্যাচারে লিপ্ত হয়ো না।" [৪৩]

২. স্বাভাবিকভাবে একজনের রক্ত, সম্পদ, সম্মান হানী করা অপরজনের জন্য হারাম। রসূলুল্লাহ স. বলেন : "তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান পরস্পরের জন্য ঐরূপ হারাম যে রূপ হারাম তোমাদের এই শহর, তোমাদের এই মাস এবং তোমাদের এই দিন।"[৪৪]

৩. কোন মুসলিমকে আতঙ্কিত করা অবৈধ। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন : "কোন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিম ভাইকে আতঙ্কিত বা সন্ত্রস্ত করা বৈধ নয়।"[৪৫]

৪. কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণকারী ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহর সদস্য নয়। এ মর্মে রসূলুল্লাহ স. বলেন : "যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলিমদের) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" [৪৬]

---

৪৩. عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه و سلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا

ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাবি, অনুচ্ছেদ : তাহরীমুয যুলম, বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবি, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ১৯৯৪

৪৪. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : কওলিন নাবিয়্যি স. রুব্বা মুবাল্লাগিন আও'আ মিন সামিঈন, বৈরুত : দারু ইবনু কাছীর, ১৯৮৭, খ. ১, পৃ. ৩৭

৪৫. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا »

ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল – আদাব, অনুচ্ছেদ : মাই ইয়াখুযুশ শাইআ 'আলাল মিযাহি, বৈরূত : দারুল কিতাব আল-আরাবিয়্য, তা. বি., খ. ৪, পৃ. ৪৫৮

৪৬. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (من حمل علينا السلاح فليس منا

ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আদ – দিয়াত, অনুচ্ছেদ : কওলুল্লাহি তা'আলা "ওয়া মান আহইয়াহা / আল – মায়িদাহ – ৩২, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৫২০

৫. কোন মুসলিমকে অস্ত্র দ্বারা হুমকি দেয়া নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ স. বলেন : "তোমাদের মাঝে কেউ যেন তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দ্বারা হুমকি না দেয়। কেননা হতে পারে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও শয়তান তার হস্তদ্বয়ে আঘাত হানার ফলে হতাহতের ঘটনা ঘটবে ; অতঃপর সে এ অপরাধের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে"।[৪৭] রসূলুল্লাহ স. বলেন : "কোন ব্যক্তি যদি লোহা দ্বারা তার ভাইকে হুমকি দেয় তবে তা থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তার প্রতি অভিশাপ করতে থাকেন যদিও হুমকি প্রদানকৃত ব্যক্তি তার সহোদর ভাই হয়।"[৪৮]

৬. আত্মঘাতি হামলার মাধ্যমে আত্মহত্যাও হারাম। রসূলুল্লাহ স. বলেন : "যে ব্যক্তি পৃথিবীতে নিজেকে কোন বস্তু দ্বারা হত্যা করবে কিয়ামতের দিন তাকে সে বস্তু দ্বারাই শাস্তি দেয়া হবে।"[৪৯] রসূলুল্লাহ স. আরো বলেন: "যে ব্যক্তি নিজেকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করবে তাকে জাহান্নামে অনুরূপভাবে শাস্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি নিজেকে আঘাত করে আত্মহত্যা করবে তাকেও জাহান্নামে অনুরূপভাবে আঘাত করা হবে।"[৫০]

৭. শুধু মুসলিম ব্যক্তিকে নয়, কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করাও নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ স. বলেন :"যে ব্যক্তি মুসলিম জনপদে বসবাসকারী

---

৪৭. عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لايدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار

ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-ফিতান, অনুচ্ছেদ : কওলুন্নাবিয়্যি স. মান হামালা আলান্নাস সিলাহা ফা লাইসা মিন্না, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৫৯২

৪৮. عن ابن سيرين أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه سمعت

ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল – বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদব অনুচ্ছেদ : আন –নাহইউ আনিল ইশারাতি বিসসিলাহি ইলা মুসলিমিন , প্রাগুক্ত; তা.বি.,খ. ৪, পৃ. ২০২০

৪৯ عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة

ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : মা ইউনহা 'আনিস সিবাবি ওয়াল লা'নি, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২২৪৭

৫০. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار

ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-জানাইয, অনুচ্ছেদ : মা জা'আ কাতিলিন নাফস, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫৯

চুক্তিবদ্ধ কোন অমুসলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, অথচ চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব হতেও তার সুগন্ধ পাওয়া যাবে।"[৫১]

৮. সন্ত্রাসীর অন্তরে দয়ামায়া থাকে না, তাই সে হতভাগা। রসূলুল্লাহ স. বলেন : "একমাত্র দুর্ভাগা ব্যক্তি হতেই দয়া ছিনিয়ে নেয়া হয়"[৫২]

৯. ইচ্ছাকৃত কোন মু'মিনকে হত্যা করা বড় গুনাহসমূহের অন্যতম যার গুনাহ আল্লাহ মা'ফ করবেন না। রসূলুল্লাহ স. বলেন : "আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনকারী ও ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যার গুনাহ ব্যতীত অন্য যে কোন গুনাহকে আল্লাহ হয়তো ক্ষমা করে দিবেন।" [৫৩]

১০. অন্যায়ভাবে মু'মিনকে হত্যাকারীর কোন ইবাদত কবুল করা হবে না। রসূলুল্লাহ স. বলেন : " যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে আল্লাহ তার কোন নফল ও ফরয ইবাদত কবুল করবেন না।" [৫৪]

১১. নিষিদ্ধ পন্থায় অপরের রক্তপাত ঘটানো মু'মিনকে উচ্চ মর্যাদা থেকে স্খলিত করে। রসূলুল্লাহ স. বলেন : "মু'মিন ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জীবন যাপন করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত হারাম পন্থায় অন্যের রক্তপাত না ঘটাবে।"[৫৫]

---

৫১. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما

ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় : আল-জিযইয়া ওয়াল মাওয়াদিআতি, অনুচ্ছেদ : ইছমু মান কাতালা মু'আহিদা বিগাইরি জুরম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৫৫

৫২. عن أبي هريرة ، قال : سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الحجرة يقول : لا تنزع الرحمة إلا من شقي

ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল- আদাব, অনুচ্ছেদ : ফির রহমাতি, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৪১

৫৩. الدرداء يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من مات مشركا ، أو مومن قتل مومنا متعمدا عن أبي يقول : كل ذنب عسى الله أن يغفره ،

ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল ফিতান, অনুচ্ছেদ : ফী তা'যীমি কতলিল মু'মিনি, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৭

৫৪. عن عبادة بن الصامت انه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل مومنا فاعتبصا بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا

ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আলফিতান, অনুচ্ছেদ : ফী তা'যীমি কতলিল মু'মিন, প্রাগুক্ত, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ১৬৭

১২. কোন মুসলিমকে হত্যা করা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার থেকেও গুরুতর। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন : "আল্লাহর নিকট সারা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার চেয়েও গুরুতর হচ্ছে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা।"[৫৬]

১৩. নিরাপত্তা প্রদানকৃত যে কোন ধর্মাবলম্বীকে হত্যাকারীর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন :"যে ব্যক্তি নিরাপত্তা প্রদানকৃত ব্যক্তিকে হত্যা করে আমার সাথে ঐ হত্যাকারীর কোন সম্পর্ক থাকবে না, যদিও নিহত ব্যক্তি কাফির হয়।"[৫৭]

সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম

আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম। আল্লাহ বলেন : **"নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন"।[৫৮] অন্য স্থানে আল্লাহ বলেন, "কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবূল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত।"[৫৯]** ইসলাম শব্দের ব্যুপত্তিগত অর্থই শান্তি। এ জীবনব্যবস্থার এরূপ নামকরণই প্রমাণ করে যে, মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার চিন্তা ইসলামের সামগ্রিক প্রকৃতি ও মৌল দৃষ্টিকোণ হতে উৎসারিত। তাই ইসলামের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান থেকে শান্তির ফল্গুধারা নিঃসৃত হয়। শান্তিময় পরিবেশের স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য শান্তি বিঘ্নিত করে এমন সকল কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ অপরিহার্য। তাই যৌক্তিকভাবেই ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠা ও এর স্থায়িত্ব বজায় রাখার স্বার্থে সকল ধরনের সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মূল করার নির্দেশনা দান করে। ইসলাম বলতে

---

৫৫ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يَزَالُ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّح الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ
ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আলফিতান, অনুচ্ছেদ : ফী তা'যীমি কাতলিল মু'মিন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৭

৫৬ عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم
ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আদ- দিয়াত আন রসূলিল্লাহ স., অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী তাশদীদি কতলিল মু'মিনি, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮৩, খ. ২, পৃ. ৪২৬

৫৭. عن عمرو بن الحمق الخزاعي من آمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
ইমাম আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুস সগীর*, অধ্যায় : হারফুল হামযাহ, অনুচ্ছেদ : আল-আলফ মিন ইসামিহি আহমাদ, বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৮৫, খ. ১, পৃ. ৪৫

৫৮. আল-কুরআন, ৩ : ১৯ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

৫৯. আল-কুরআন, ৩ : ৮৫ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

প্রথমত ও প্রধানত কুরআন ও রসূল স.-এর সুন্নাহ বা হাদীসকেই বুঝায়। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, এই দু'টি জিনিসকে যতক্ষণ আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না, সে দু'টি জিনিস হলো আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন ও তাঁর রসূল স.-এর সুন্নাহ তথা হাদীস।"[৬০]

তাই সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা বলতে সন্ত্রাস প্রতিরোধে কুরআন ও রসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহতে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, সন্ত্রাস প্রতিরোধক আয়াত, হাদীস ও রসূলুল্লাহ স.-এর আদর্শ এত বেশি যে, তার সবগুলো এই স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা অসম্ভব। তাই এ ব্যাপারে ঐ তিন উৎসের মৌলিক নির্দেশনাসমূহ নিম্নে পেশ করার প্রয়াস পাচ্ছি।

সন্ত্রাস প্রতিরোধে আল-কুরআনের নির্দেশনা

আল-কুরআনে প্রথমত সাধারণভাবে সন্ত্রাসের কারণ সৃষ্টি হওয়ার ছিদ্রপথ বন্ধ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১. ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ ও অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ করতে নিষেধ প্রদান করে আল-কুরআনে নির্দেশনা এসেছে যে, "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালঙ্ঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"[৬১]

২. সন্ত্রাস মূলত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের ফলেই সৃষ্ট। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন, বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করে আল-কুরআনে নিষেধজ্ঞা এসেছে। আল্লাহ বলেন :"বল, হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের দীন সম্বন্ধে অন্যায় ভাবে বাড়াবাড়ি কর না; এবং যে সম্প্রদায় ইত:পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে ও সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।"[৬২] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "যারা

---

৬০. عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم هما كتاب الله وسنة نبيه

ইমাম মালিক, *আল-মুয়াত্তা*, অধ্যায় : আল-ক্বাদর, অনুচ্ছেদ : আন-নাহ্ইউ আনিল কওলি বিল ক্বাদর, মিসর : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবিয়্যি, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৮৯৯

৬১. আল-কুরআন, ১৬ : ৯০ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

৬২. আল-কুরআন, ৫ : ৭৭ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালঙ্ঘন কর না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না"।[৬৩] উপরোক্ত প্রথম আয়াতে আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে এবং দ্বিতীয় আয়াতে সশস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রের প্রসঙ্গ বর্ণিত হলেও অন্যান্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি মুসলিমদের জন্যও সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ।

৩. পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ। সন্ত্রাস নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তাই সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আল-কুরআনে নির্দেশনা এসেছে। আল্লাহ বলেন : "দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে বিপর্যয় ঘটাইও না, তাঁকে ভয় ও আশার সাথে ডাকবে। নিশ্চয় আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।"[৬৪]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশ্বখ্যাত মুফাসসির হাফিয ইবনে কাছীর র. বলেন,

ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض، وما أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد، ثم وقع الإفساد بعد ذلك، كان أضر ما يكون على العباد. فنهى الله تعالى عن ذلك

"শান্তি স্থাপনের পর ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় ও যে সকল কর্মকাণ্ড পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তা থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। কেননা যখন কাজ-কারবার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যথাযথভাবে চলতে থাকে, তখন যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়, তবে তা হবে বান্দার জন্য বেশী ক্ষতিকর। এজন্য আল্লাহ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।"[৬৫]

ইমাম কুরতুবী র. বলেন, أنه سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر

"স্বল্প-বিস্তর যতটুকুই হোক শান্তি স্থাপনের পর আল্লাহ পৃথিবীতে কম বা বেশি যাই হোক বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন।"[৬৬]

অনর্থ বিপর্যয় সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হতে নিষেধ করে আল্লাহ বলেন : "আল্লাহ যাহা তোমাকে দিয়েছেন তা দ্বারা আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ

---

[৬৩]. আল-কুরআন, ২ : ১৯০ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

[৬৪]. আল-কুরআন, ৭ : ৫৬ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

[৬৫]. ইমাম ইবনে কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, রিয়াদ : দারুত ত্বায়্যিবাহ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী', ১৯৯৯, খ. ৩, পৃ. ৪২৯

[৬৬]. ইমাম কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন*, রিয়াদ : দারু 'আলামিল কুতুব, ২০০৩, খ. ৭, পৃ. ২২৬

ভুলো না; তুমি অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না, আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না"।[৬৭]

৪. সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন :"আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।"[৬৮] আদম সন্তানকে সম্মানিত ঘোষণা করে আল্লাহ্ বলেন : "আমি তো আদম -সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি ; তাদেরকে উত্তম রিয্ক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"[৬৯] এত মর্যাদাবান ও অনুগ্রহপুষ্ট শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী সমগ্র মানবজাতির কোন এক সদস্যের প্রাণহাণী ঘটানোকে সমগ্র মানবজাতির প্রাণহানী ঘটণার সাথে তুলনা করে আল্লাহ্ বলেন : "এই কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করা ব্যতীত কেউ কাউকেও হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল।"[৭০] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ইচ্ছাকৃত কোন মু'মিনকে হত্যা করার শাস্তি বর্ণনা করে বলেন : "কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম ; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত (অভিশাপ) করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।"[৭১]

৫. সম্প্রতি সন্ত্রাসীদের উদ্দেশ্য অর্জনে আত্মঘাতি হামলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই হামলার মাধ্যমে সন্ত্রাসী তার নিজের জীবনকে ধ্বংস করে ফেলে। অথচ আল-কুরআনে নিজেকে ধ্বংস করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মঘাতি হামলা আত্মহত্যার শামিল, আর উভয়ই স্পষ্ট হারাম।

---

৬৭. আল-কুরআন, ২৮ : ৭৭ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

৬৮. আল-কুরআন, ৬ : ১৫১, ১৭ : ৩৩ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

৬৯. আল-কুরআন, ১৭ : ৭০ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

৭০. আল-কুরআন, ৫ : ৩২ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

৭১. আল-কুরআন, ৪:৯৩ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

আল্লাহ্ বলেন: "নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ কর না। তোমরা সৎকাজ কর, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণ লোকদের ভালবাসেন।"[৭২]

এভাবে আল-কুরআনুল কারীমে অসংখ্য আয়াতে অন্যায়ভাবে মানব হত্যা, আহত করা, আহত্যা করা, অন্যের সম্পদ লুট করা, পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা, বিশৃঙ্খলা ঘটানোসহ সন্ত্রাসের বিভিন্ন রূপ, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট,পরিণাম, প্রতিরোধ, শাস্তি সম্পর্কে নির্দেশনা এসেছে। এসব আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে রসূলুল্লাহ্ স. এর হাদীসে এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত নির্দেশনা পাওয়া যায়।

সন্ত্রাস প্রতিরোধে আল–হাদীসের নির্দেশনা

সন্ত্রাস প্রতিরোধে আল–কুরআনে বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে আল–হাদীসেও ব্যাপক নির্দেশনা এসেছে। প্রাসঙ্গিক কারণে কিছু হাদীস নিম্নে পেশ করা হলো-

১. রসূলুল্লাহ্ স. বলেন :"বিবাহিতা ব্যভিচারী, হত্যার বদলে হত্যা এবং দ্বীন (ইসলাম) ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার অপরাধ ব্যতীত 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল' এ সাক্ষ্য দানকারী কোন মুসলিমের রক্ত বৈধ নয়।"[৭৩]

২. সন্ত্রাস অর্থই হচ্ছে ত্রাস, ভয় আতঙ্ক সৃষ্টি করা, অন্যকে আতংকিত করা। কিন্তু আল–হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যে, কোন মুসলিমকে আতংকিত করা বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ স. বলেন :"কোন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিম ভাইকে আতংকিত বা সন্ত্রস্ত করা বৈধ নয়।"[৭৪]

৩. সন্ত্রাস একটি অন্যায় কর্ম। যে কোন অন্যায় কর্ম দেখে তা প্রতিরোধ করা প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব। সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ প্রচেষ্টা পরিচালিত করার নির্দেশনা প্রদান করে রসূলুল্লাহ্ স. বলেন : "তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি

---

৭২. আল-কুরআন, ২:১৯৫ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

৭৩. عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة

ইমাম বুখারী, *সহীহ আল–বুখারী,* অধ্যায় : আদদিয়াত , অনুচ্ছেদ : কওলুল্লাহ তা'আলা " ইন্নান নাফসা বিন নাফসি .... হুম যালিমূন (আল– মায়িদাহ – ৪৫), প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৫২১

৭৪. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِىِّ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - -صلى الله عليه وسلم- فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ صلى الله عليه وسلم- « لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا »

ইমাম আবু দাউদ, *আস–সুনান*, অধ্যায় : আল – আদাব, অনুচ্ছেদ : মাই ইয়াখুযুশ শাইআ 'আলাল মিযাহি, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৫৮

অন্যায় করতে দেখবে, সে যেন তাকে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করে। যদি সম্ভব না হয় তাহলে কথা দ্বারা প্রতিবাদ করবে, তাও সম্ভব না হলে অন্তর দ্বারা প্রতিবাদ করবে। এটিই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।"[৭৫]

সন্ত্রাস সম্পর্কে উল্লেখিত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রমাণ হয় যে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ইসলাম সমর্থনতো করেই না, বরং তা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যারা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে কিংবা ভীতি প্রদর্শন করে তারা প্রকৃত পক্ষে মুসলিম নয়। তারা ইসলামের তথা কুরআন ও হাদীসের রীতিনীতি ও নির্দেশনাকে বিসর্জন দিয়েছে। তেমনি বর্তমানে যারা ধর্মের নামে বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলা করে নির্বিচারে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছে এবং বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিয়ে মানষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে তারা মুসলিমদের দলভুক্ত নয়। তাদেরকে ইসলামী দলের অন্তর্ভুক্ত মনে করে তাদের কোন সহযোগিতা করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "তোমরা সৎ ও তাকওয়াভিত্তিক কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর, পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর না।"[৭৬] বরং তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তাদের প্রতিরোধ করতে হবে।

সন্ত্রাস প্রতিরোধে রসূলুল্লাহ স. এর কার্যক্রম

মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে অশান্ত ও বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে শান্তি, শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন :"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"[৭৭] এজন্য তিনি সর্বদাই বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতন ও তৎপর ছিলেন এবং সন্ত্রাস, অন্যায়, অনাচার, অত্যাচার প্রতিরোধে সমগ্র জীবন বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছেন। রসূল স. একদিকে ছিলেন শান্তিস্থাপনকারীদের জন্য সুসংবাদদানকারী অপরদিকে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের জন্য ছিলেন সতর্ককারী। আল্লাহ বলেন :"হে নবী! আমি তো আপনাকে

---

৭৫. هذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায়: আল ঈমান, অনুচ্ছেদ : বায়ানু কওলিন নাহয়ি 'আনিল মুনকারি মিনাল ঈমান .... ওয়াজিবানে, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৯

৭৬. আল-কুরআন, ০৫:০২ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

৭৭. আল-কুরআন, ২১:১০৭ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।"[৭৮]

উজ্জ্বল প্রদীপরূপী রসূল স. তাঁর সমগ্র জীবনে যে আদর্শ বাস্তবায়িত করেছেন, তা অনুসরণের মাধ্যমে আজো পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ করা সম্ভব। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ অনুকরণীয় হিসেবে রসূলুল্লাহ স. কেই গ্রহণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[৭৯]

সামাজিক বন্ধনহীন পরিস্থিতি, অস্থির ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ, বলগাহীন নেতৃত্ব, শঠতা, প্রবঞ্চনা, হত্যা, লুটতরাজ প্রভৃতি অকল্যাণকর কার্যকরণের ফলশ্রুতিতে আরবের গোত্রে গোত্রে কলহ বিবাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ সর্বত্র স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। মানুষের শান্তিময় জীবন মারাত্মকভাবে লংঘিত হতে থাকলে জনসাধারণ এই অশান্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। উদ্বিগ্ন মানুষের উদ্বেগকে দূর করার জন্য রসূলুল্লাহ স. যে কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল "হিলফুল ফুযুল" নামক চুক্তি সম্পাদন। রসূলুল্লাহ স. এর বয়স যখন ১৫ বছর[৮০] মতান্তরে ১৭ বা ২০ বছর তখন আরবের কায়স ও কিনানার গোত্রসমষ্টির মধ্যে হজ্জের পবিত্র ও সম্মানিত মাসে 'হারবুল ফুজ্জার' সংঘটিত হয়।[৮১] এই যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী হাশিম সম্প্রদায়ের নেতা আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র জুবাইরের প্রস্তাবে মক্কার আব্দুল্লাহ ইবনে জাদ'আনের বাসভবনে বনী হাশিম, বনী যুহরা, বনী তাঈম, বনী মুত্তালিব, বনী আসাদ গোত্রের সকলে সম্মিলিতভাবে অন্যায়, অত্যাচার, সন্ত্রাস প্রতিরোধ করতে ঐকমত্যে উপনীত হয় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। মুহাম্মদ স. এই চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেন।

---

৭৮. আল-কুরআন, ৩৩ : ৪৫-৪৬ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا () وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

৭৯. আল-কুরআন, ৩৩ : ২১ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

৮০. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম*, অনু. খাদিজা আখতার রেজায়ী, ঢাকা : আল কোরআন একাডেমী লন্ডন (পরিবেশিত), ১৯৯৯, পৃ. ৭৫

৮১. আ. ফ. ম আব্দুল হক ফরিদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, খ. ২০, পৃ. ৫৭৪

চুক্তিটিকে ইতিহাসে 'হিলফুল ফুযুল' নামে অভিহিত করা হয়।[৮২] এই চুক্তিতে আবদ্ধ গোত্রসমূহ যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার সারমর্ম হলো:

১. আমরা দেশের অশান্তি দূর করার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

২. বিদেশী লোকদের ধন-প্রাণ ও মান–সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

৩. দরিদ্র ও অসহায় লোকদের সহায়তা করতে আমরা কখনই কুণ্ঠিত হবো না।

৪. অত্যাচারী ও তার অত্যাচারকে দমাতে ও ব্যাহত করতে এবং দুর্বল দেশবাসীদেরকে অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।[৮৩] এই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী হিলফুল ফুযুলের সদস্যগণ বহুদিন যাবত কাজ করতে থাকেন। এই সেবা–সংঘের প্রচেষ্টায় দেশের অত্যাচার অবিচার বহুলাংশ হ্রাস পেলো, রাস্তাঘাট নিরাপদ হয়ে উঠল। রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতিষ্ঠিত হিলফুল ফুযুল সংঘ ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ইসলামের আগমনের পর এই সেবা সংঘ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল। কারণ, সকল প্রকার অন্যায়, অমঙ্গল ও পাপের মূলোৎপাটন করার এবং সর্বাধিক ন্যায়, মঙ্গল ও পুণ্য সাধনের দায়িত্ব নিয়ে যখন 'ইসলাম' আত্মপ্রকাশ করল তখন আর উক্ত সেবাসংঘের কোন প্রয়োজনই রইল না।[৮৪]

সন্ত্রাস প্রতিরোধে তরুণ বয়সে মুহাম্মদ স. যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার বাস্তবায়ন তার সমগ্র জীবনে পরিলক্ষিত হয়। তিনি নবুওয়াত পাওয়ার পরেও এই প্রতিজ্ঞার কথা ভুলেননি। তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির পর কোন একদিন বলেন :"আজও যদি কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি "হে ফুযুল প্রতিজ্ঞার ব্যক্তিবর্গ' বলে ডাক দেয়, আমি অবশ্যই তার ডাকে সাড়া দেব। কারণ, ইসলাম এসেছে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং উৎপীড়িত, অত্যাচারিতকে সাহায্য করতে।[৮৫] এভাবে মহানবী স. মক্কানগরী থেকে অন্যায়, অত্যাচার ও সন্ত্রাস দূর করে শান্তি–শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং পরবর্তী সময়ের জন্য সন্ত্রাস প্রতিরোধের আদর্শ রেখে গিয়েছেন।

---

৮২. মো. আব্দুল কাসেম, *মানবশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ স.*, রাজশাহী : মোসা. হোসনে আরা বেগম, ২০০৫, পৃ. ৬৭; আল্লামা ছফিউর রহমান মোবরাকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

৮৩. মোহম্মদ আকরম খাঁ, *মোস্তফা–চরিত*, ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, নবম মুদ্রণ, ২০১০, পৃ. ১৮৮

৮৪. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা স. সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, সম্পাদনা : ড. এ. এইচ. এম মুজতবা হোছাইন, ঢাকা : ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ. ২০১

৮৫. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

রসূল স. নবুওয়াত লাভের পর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অহীভিত্তিক ফর্মুলা অনুযায়ী বিশ্বকে গড়ে তোলার জন্য সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত করেন। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস কোন সাফল্যজনক পদ্ধতি হতে পারে না। বিশেষ করে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ যদি সমাজে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়ে–যেমনটি মহানবী স. এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবে হয়েছিল, তাহলে সন্ত্রাস নির্মূলে সন্ত্রাসী নির্মূলের নির্বুদ্ধিতাগত নীতির ফলে পুরো সমাজটাকেই প্রায় নির্মূল করে ফেলতে হবে। আবার সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করার কোন ব্যবস্থা না নিয়ে বসে থাকলে সন্ত্রাস ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। উভয় অবস্থায়েই সমাজের সর্বনাশ অনিবার্য। তাই মহানবী মুহাম্মদ স. সন্ত্রাস প্রতিরোধে মধ্যপন্থা গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্ব থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করে তথায় শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় মহানবী স. তাঁর সমগ্র নবুওয়াতী জীবন ব্যয় করেছিলেন। সন্ত্রাস প্রতিরোধ বা নির্মূলে তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদক্ষেপ অগণিত। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

ক. বাই'আতে আকাবা

নবুওয়াতের দ্বাদশ বছর হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আগত লোকদের মধ্যে ১২ জন রসূলুল্লাহ স. এর সাথে আকাবা নামক স্থানে সাক্ষাত করলে তারা তাঁর নিকট ইসলাম গ্রহণ পূর্বক অনৈসলামিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করার অঙ্গীকার করলেন। এই অঙ্গীকার গ্রহণ অনুষ্ঠানকে আকাবার প্রথম বাইয়াত বলা হয়।[৮৬] এই বাইআতে সাহাবাগণ যে বিষয়গুলোর উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তার বিবরণ দিয়ে বাই'আতের অন্যতম সদস্য উবাদা ইবনুস সামিত রা. বলেন : "আমরা রসূলুল্লাহ স. এর সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার (শরীক) করবো না, চুরি–ডাকাতি করবো না, ব্যভিচার করবো না, সন্তান হত্যা করবো না, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাবো না এবং ন্যায়সঙ্গত ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স. এর অবাধ্যতা করবো না। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. বললেন :"এসব অঙ্গীকার পূরণ করলে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে। আর এর কোন একটি ভঙ্গ করলে তোমাদের পরিণতি আল্লাহর হাতে ন্যস্ত থাকবে। ইচ্ছে করলে মাফ করে দিবেন, ইচ্ছা করলে তিনি শাস্তি দিবেন।"[৮৭]

---

৮৬. ইবনে হিশাম, *সীরাতে ইবনে হিশাম*, অনু. আকরাম ফারুক, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৩, পৃ. ১১৫

৮৭. عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن أصحابه ليلة العقبة أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وحوله عصابة من أصحابه (تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن

এই প্রতিজ্ঞার বিষয়াবলীর সবগুলোই প্রত্যক্ষভাবে সন্ত্রাসের সাথে সম্পৃক্ত। তাই মহানবী স. সন্ত্রাস প্রতিরোধে সর্বপ্রথম তার সাহাবাদেরকে সকল সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন, যার ফলে পরবর্তীকালে মক্কা-মদীনাসহ সমগ্র ইসলামী বিশ্ব থেকে সন্ত্রাস নির্মূল হয়েছিলো।

খ. মদীনার সনদ

কাফির-মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মহানবী স. মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় স্থায়ীভাবে শান্তি শৃংখলা রক্ষা এবং সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে মদীনায় বসবাসকারী অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বিশেষত ইয়াহুদীদের সাথে তিনি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন, যা ইতিহাসে মদীনার সনদ (Charter of Madina) নামে খ্যাত।[৮৮] নবী মুহাম্মাদ স. এর পক্ষ থেকে কুরাইশী, মদীনাবাসী, তাদের অধীনস্থ এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্টদের এবং জিহাদে অংশগ্রহণকারী মু'মিন ও মুসলিমদের মধ্যে সম্পাদিত এ অঙ্গীকারনামায় সন্ত্রাস প্রতিরোধক যে ধারাগুলো ছিলো তা নিম্নরূপ :

১. যারা বাড়াবাড়ি করবে, সকল সত্যনিষ্ঠ মুসলিম তাদের বিরোধিতা করবে। ঈমানদারদের মধ্যে যারা যুলুম অত্যাচার, পাপ, দাঙ্গা-হাঙ্গমা বা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করবে, সকল মু'মিন তাদের বিরোধিতা করবে।

২. মু'মিনরা সম্মিলিতভাবে অন্যায়কারীর বিরূদ্ধে থাকবে। অন্যায়কারী কোন মু'মিনের সন্তান হলেও এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হবে না।

৩. কোন ব্যক্তি যদি কোন মু'মিনকে হত্যা করে এবং তার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে এর পরিবর্তে তার কাছ থেকে কিসাস আদায় করা হবে। অর্থাৎ হত্যার অপরাধে অপরাধী হওয়ায় তাকেও হত্যা করা হবে। তবে যদি নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে হত্যাকারী ক্ষতিপূরণ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারে, তবে সে ক্ষেত্রে কিসাস করা হবে না।

৪. কোন হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী বা বিদ'আতীকে সাহায্য করা মু'মিনের জন্য বৈধ বিবেচিত হবে না। অশান্তি সৃষ্টিকারী কোন ব্যক্তিকে কেউ আশ্রয় দিতে

وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه) . قال فبايعته على ذلك

ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : ফাযায়িলুস সাহাবা, অনুচ্ছেদ : উফূদুল আনসার ইলান নাবিয়্যি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বি মাক্কাতা ওয়া বাই'আতুল আকাবা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪১৩

৮৮. নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত , *সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রবন্ধকার : ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ ও মোহাম্মদ অতীকুর রহমান, প্রবন্ধ : সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ. ১১৪

পারবে না। যদি কেউ আশ্রয় দেয় বা সাহায্য করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে। ইহলৌকিক জীবনে তার ফরয ও নফল ইবাদাত কোনটাই কবুল হবে না।[৮৯]

গ. সন্ত্রাসীদের শাস্তিদান

সন্ত্রাস প্রতিরোধে মহানবী স. সন্ত্রাসীদের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। কারণ তিনি জানতেন সন্ত্রাসকে অঙ্কুরেই নির্মূল করা না হলে তা ক্রমেই সমাজ–রাষ্ট্র ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছবে। তখন ইচ্ছা হলেই তা আর নির্মূল বা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। যেমন অবস্থা বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে দেখা যাচ্ছে। তাই দূরদর্শী বিশ্বনবী মুহাম্মাদ স. আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে সন্ত্রাসকে সমূলেই নির্মূল করেছিলেন। নিম্নের ঘটনাটি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত :"উকল বা উরাইনা গোত্রের কিছু লোক (ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে) মদীনায় এলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল। নবী স. তাদেরকে (সদকার) উটের নিকট যাওয়ার এবং পেশাব ও দুধ পান করার নির্দেশ দিলেন। তারা সেখানে চলে গেল। অতঃপর তারা যখন (উটের পেশার ও দুধ পান করে) সুস্থ হলো তখন তারা নবী স. এর রাখালকে হত্যা করল এবং উটগুলো তাড়িয়ে নিয়ে গেল। এ সংবাদ দিনের প্রথম ভাগেই (তাঁর নিকট) এসে পৌঁছল। তারপর তিনি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য লোক পাঠালেন। বেলা বাড়লে তাদেরকে পাকড়াও করে আনা হলো। অতঃপর তাঁর আদেশে তাদের হাত পা কেটে দেয়া হলো। উত্তপ্ত শলাকা দিয়ে তাদের চোখ ফুটিয়ে দেয়া হলো এবং গরম পাথুরে ভূমিতে তাদের নিক্ষেপ করা হলো। এমতাবস্থায় তারা পানি প্রার্থনা করছিল কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হয়নি। আবূ কিলাবাহ র. বলেন, এরা চুরি করেছিল, হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল, ঈমান আনার পর কুফরী করেছিল এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল"।[৯০]

ঘ. সন্ত্রাসীদের উৎখাতকরণ

দেশ থেকে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সন্ত্রাস নির্মূলের প্রয়োজনে মহানবী মুহাম্মাদ স. কখনও সন্ত্রাসীদেরকে গোষ্ঠীসহ উৎখাত করেছিলেন। ইয়াহুদী গোত্র বানূ নাযীর মহানবী স. কে সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। ঘটনা প্রমাণিত হওয়ার পর মহানবী স. তাদেরকে তাদের আবাসস্থল থেকে উৎখাত করে

---

[৮৯]. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬–১৯৭

[৯০]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল–বুখারী*, অধ্যায় : আল–উযূ, অনুচ্ছেদ : আবওয়াবুল ইবিলি ওয়াদ-দাওয়াব্বি ওয়াল-গানামী ওয়া মারাবিযিহা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১

অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়ার মাধ্যমে মদীনাকে সন্ত্রাসমুক্ত করেন। ঘটনাটির বিবরণ হলো : "সাহাবী আম্‌র ইবনে উমায়্যা আদ-দামরী রা. বানূ 'আমিরের দু'জন লোককে ভুলবশত শত্রুপক্ষ মনে করে হত্যা করেন। প্রকৃত ব্যাপার হল, বানূ 'আমিরের সাথে মহানবী স. এর মৈত্রীচুক্তি ছিল। ফলে মহানবী স. তাদেরকে 'রক্তপণ' দিতে মনস্থ করেন। আর এ কাজে সহযোগিতা ও মধ্যস্থতা করার জন্য তিনি ইয়াহূদীদের সবচেয়ে বড় গোত্র বানূ নাযিরের নিকট যান। তাদের ব্যবসা ছিল মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে উপকণ্ঠে। বানূ 'আমিরের সাথে বানূ নাযীরেরও মৈত্রীচুক্তি ছিল। বানূ নাযিরের লোকজন মহানবী স. কে দেখে আনন্দ প্রকাশ করে বরং তাঁর সাথে প্রথমত খুবই ভাল ব্যবহার করে। তারা এ ব্যাপারে তাঁকে সহযোগিতার পূর্ণ আশ্বাস দেয়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। মহানবী স. তাদের একটি দেয়াল ঘেষে বসে ছিলেন, তাঁর সাথে আবূ বকর, ওমর ও আলী রা. প্রমুখ দশজন সাহাবীও ছিলেন। বানূ নাযীরের লোকজন নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করতে লাগলেন যে, এমন মোক্ষম সুযোগ আমরা আর কখনো পাব না। আমাদের কেউ যদি ঘরের ছাদে উঠে তাঁর মাথার উপর একটি ভারী পাথর ছেড়ে দেয় তাবে আমরা চিরতরে তার হাত থেকে নিস্কৃতি পাব। 'আমর ইব্‌ন জাহ্‌হাশ ইব্‌ন কা'ব নামে তাদের এক লোক বলল, আমি এ কাজের জন্য প্রস্তুত। এই বলে সে ঠিকই মহানবী স. এর উপর পাথর ছেড়ে দেয়ার জন্য সবার অলক্ষ্যে ঘরের ছাদে উঠে গেল। তখনই মহান আল্লাহ্ মহানবী স. কে ওহী মারফত এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দেন। সাথে সাথে মহানবী স. সেখান থেকে উঠে পড়েন এবং কাউকে কিছু না বলে সোজা মদীনায় চলে আসেন। তাঁর সঙ্গে থাকা সাহাবীগণও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। অতঃপর মদীনা থেকে আগত এক ব্যক্তিকে পেয়ে তাকে মহানবী স. সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বলল, আমি তাঁকে মদীনায় প্রবেশ করতে দেখেছি। অতঃপর তাঁরা মদীনায় এসে মহানবী স. এর সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি তাদেরকে ইয়াহূদীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানালেন এবং সকলকে রণপ্রস্তুতি নিয়ে তাদের মুকাবিলা করার জন্য বের হবার নির্দেশ দিলেন।

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে উম্ম মাকতুম রা. কে মদীনার দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে তিনি সেনা সমভিব্যবহারে বানূ নাযীরের বসতিতে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে তিনি তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করেন। ছয়দিন অবরোধ করার পর তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য তাদের খেজুর গাছ কেটে ফেলেন এবং বাগান জ্বালিয়ে দেন।"[৯১]

---

[৯১]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় : আত-তাফসীর, অনুচ্ছেদ : মা কতা'তুম মিন লিনাতিন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৭৯

তখন মহানবী স. এর সমর্থনে আয়াত নাযিল হয় : "তোমরা যে খেজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে; তা এজন্য যে, আল্লাহ্ পাপচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন"।[৯২]

মূলত সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে যুদ্ধকৌশল হিসাবে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। অবশেষে বানূ নাযীরের মনে মহান আল্লাহ্ ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তারা নিজেদেরই প্রস্তাব দিয়ে দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবার পথ বেছে নিল। অন্যত্র গিয়ে যাতে তারা আবার সন্ত্রাস করতে না পারে সেজন্য মহানবী স. তাদেরকে সাথে করে অস্ত্র নিয়ে যেতে দেন নি। শুধুমাত্র নিজেদের উটের পিঠে করে যে পরিমাণ মালপত্র নেয়া যায় সে পরিমাণই নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

এ আদেশ এত কঠোর ছিল যে, তিলতিল করে গড়ে তোলা নিজেদের ঘরবাড়ি তাদের নিজেদের হাতেই ভেঙ্গে ফেলতে হল। আর তার যতটুকু পারা যায় ততটুকু সাথে নিয়ে অবশিষ্ট আসবাবপত্র ছেড়ে যেতে হল। তাদের কতক খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে, আর কতক চলে যায় সিরিয়ায়। ফলে মদীনা মুনাওয়ারা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অভিশপ্ত ইয়াহূদীদের এ গোত্রটির কূটিল ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের হাত থেকে রেহাই পায়।

ঙ. সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান

সন্ত্রাসীদের নির্মূল করে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহানবী স. প্রয়োজন হলেই সন্ত্রাসীদের বিরূদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতেন। এমনই একটি অভিযান তিনি তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মদীনার নিকটবর্তী যু'আমর নামক স্থানে মুসলিমদের পরাজিত ও নিঃশেষ করার দৃঢ় সংকল্পে একত্রিত বনী ছা'লাবা এবং বনী মুহারিব গোত্রদ্বয়ের এক বিরাট বাহিনীর বিরূদ্ধে পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসীরা মুসলিম সৈন্যবাহিনীর আগমনের সংবাদে ছত্রভঙ্গ হয়ে আশেপাশের পাহাড়গুলোতে আত্মগোপন করে। রসূলুল্লাহ্ স. তাঁর অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখেন এবং সৈন্যবাহিনীসহ সন্ত্রাসীদের অবস্থানস্থল পর্যন্ত গমন করেন এবং কিছু দিন সেখানে অতিবাহিত করে মদীনায় ফিরে আসেন।[৯৩] এই অভিযানের পর পরই মুহারিব গোত্র সন্ত্রাসের পথ পরিহার করে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে চলে এসেছিল। তবে ছা'লাবা গোত্র এর পরও কিছুদিন ধরে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ

---

৯২. আল-কুরআন, ৫৯ : ০৫ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ

৯৩. অধ্যাপক এ. টি.এম. মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, খ . ৬, পৃ ৪৭৫–৪৭৬; আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ . ২৪৭

অব্যাহত রাখে। এর ফল হিসাবে ৬২৬-৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে আরো ৫টি অভিযান প্রেরণ করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যাতুর রিকার বিরুদ্ধে মহানবী স. এর নেতৃত্ব পরিচালিত অভিযান। পঞ্চম হিজরীর মুহাররম মাসে পরিচালিত এই অভিযান যাতুর রিকাহ গোত্রের অবাধ্যতামূলক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এক বিরাট নিবৃত্তকারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এরপর থেকে মহানবী স. এর বিরুদ্ধে ছা'লাবার তীব্র বিরোধিতার অবসান ঘটে। এবং সপ্তম হিজরীর শেষ নাগাদ ছা'লাবা গোত্রের মধ্যে ইসলামের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিলো।[৯৪]

এভাবে মহানবী মুহাম্মাদ স. তাঁর সমগ্র মাদানী জীবনে দেশী ও বিদেশী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হাত থেকে সমসাময়িক মদীনা কেন্দ্রিক ইসলামী রাষ্ট্রের এবং পরবর্তীকালের সমগ্র আরব উপদ্বীপকে সন্ত্রাসমুক্ত করে সন্ত্রাস নির্মূলে বিশ্ববাসীর সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে যান। সন্ত্রাস নিমূলে তাঁর কার্যক্রমের উপর আত্মবিশ্বাস থেকে তিনি ঘোষণা দিয়ে যান যে, "এমন একদিন আসবে যেদিন একজন আরোহী একাকী সানআ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে এবং সে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কাউকে (কোন সন্ত্রাসীকে) ভয় পাবে না।"[৯৫]

এ প্রবন্ধে সন্ত্রাস প্রতিরোধে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা ও রসূলুল্লাহ স.-এর কার্যক্রম বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম মানবীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ধর্মীয় সহনশীলতা বৃদ্ধি, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি রোধ, আদর্শ সমাজ গঠন, নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছে। আর ইসলামী দন্ডবিধি প্রতিষ্ঠা সন্ত্রাসসহ যেকোন অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো বর্তমান সৌদি আরব। সেখানে ইসলামী দন্ডবিধি কার্যকর থাকায় অপরাধের হার সারাবিশ্বের চেয়ে অনেক নিচে।[৯৬]

---

৯৪. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী, *রাসূল মুহাম্মদ স.- এর সরকার কাঠামো*, অনুবাদ. মুহাম্মদ ইবরাহীম ভূঁইয়া, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৩০-৩১

৯৫. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : ফাযায়িলুস সাহাবা, অনুচ্ছেদ : মা লাকিয়ান নাবিয়্যি স. ওয়া আসাহাবুহু মিনাল মুশরিকীনা বি মাক্কাতা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩৯৮

৯৬. মোহাম্মদ আলী মনসুর, *বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল'রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১০, পৃ: ২০

উপসংহার

বিশ্ববাসী ইসলামের ব্যাপক আবেদন থাকা সত্ত্বেও হিংসা ও স্বভাবজাত শত্রুতাবশত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বিশেষ করে ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা ইসলাম ও মুসলিমদের নামে নানা কুৎসা রটাচ্ছে। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ইসলাম ও এর অনুসারীরা ইসলাম বিরোধীর নিকট থেকে যেসব ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে বর্তমান সন্ত্রাসকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করার অপচেষ্টাও সেসবের অন্যতম। একদিকে ইহুদী–খ্রিষ্টান–পৌত্তলিকদের ষড়যন্ত্র অপরদিকে জন্মগতভাবে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি, এদুয়ে মিলে ইসলাম আজ পৃথিবীতে 'ভুলবোঝা ধর্মে' (The Misunderstood Religion) পরিণত হয়েছে, যেমনটি বলেছেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মাদ কুতুব র.।[৯৭] তবে আশার কথা, মুসলিমরা এখন ধীরে ধীরে তাদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করার চেষ্টা শুরু করেছে। সন্ত্রাসের সাথে যে ইসলামের কোন রকম সম্পর্ক নেই সে কথা উপর্যুক্ত আলোচনায় কিছুটা হলেও স্পষ্ট হয়েছে। ইসলামের অবস্থান কুরআন, হাদীস ও রসূল স. এর জীবনাদর্শে চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে। কুরআন, হাদীস ও রসূলুল্লাহ স. এর জীবনাদর্শ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ নয়, বরং চরম বিরোধী। শান্তিকে বিঘ্নিত করে এমন কোন কর্মকাণ্ডকে ইসলাম সমর্থন করে না, উপরন্তু বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের চিরন্তন নীতি। ইসলাম স্বভাবগত কারণেই কখনো সন্ত্রাসে বা বিশ্বশান্তি নষ্ট করে এমন কর্মে উৎসাহ, সমর্থন, অনুমোদন দেয় না। মুসলিম কখনো সন্ত্রাসী হতে পারে না। তাছাড়া গুটিকতক তথাকথিত মুসলিমের কর্ম বিচার করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামকে সন্ত্রাসের সাথে সম্পৃক্ত করা কখনোই উচিত নয়।

---

৯৭. Muhammad Qutb, Islam – The Misunderstood Religion, Kuwait : International Islamic Fedaration of Student Organizations, 1401 A.H./1981 A.D.

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮ সংখ্যা-৩২
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১২

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প : সমস্যা ও সুপারিশ

মোঃ ফেরদাউসুর রহমান*

[সারসংক্ষেপ : দারিদ্র্য বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আর.ডি.এস.) নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আর.ডি.এস-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য শুধু বিনিয়োগ প্রদান ও আদায় করা নয়, সদস্যগণকে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন জনগোষ্ঠী হিসাবে গড়ে তোলাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ গবেষণা কর্মটির উদ্দেশ্য হল আর.ডি.এস.-এর কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা, সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা। এ লক্ষে দুই সেট প্রশ্নমালার মাধ্যমে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ শাখার ১০০ (৫০+৫০) জন বিনিয়োগ গ্রহীতা এবং ২০ (১০+১০) জন ফিল্ড অফিসারের কাছ থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকরে গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য এবং আর.ডি.এস. কর্তৃক সরবরাহকৃত বিভিন্ন সময়ের বার্তা, ম্যানুয়াল, হেড অফিস প্রদত্ত বিভিন্ন সার্কুলার, বিভিন্ন জার্নাল, আর্টিকেল, মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকা, দৈনিক পত্রিকা, ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং এর উপর বিভিন্ন বই ইত্যাদির ভিত্তিতে আর.ডি.এস. পরিচালনায় কিছু সমস্যা চিহ্নিত করে কতিপয় পরামর্শ দেয়া হয়েছে। পরামর্শগুলো গ্রহণ করে এ প্রকল্প আরো সুন্দরভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে। এ প্রবন্ধে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এর পরিচয়; পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা আলোচনা করা হয়েছে।]

ভূমিকা

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যই ছিল অবহেলিত দরিদ্র মানুষসহ সকল শ্রেণীর মানুষকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-নির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি তথা পল্লী খাত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। অথচ এই পল্লী জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে মানবেতর জীবন যাপন করছে। তাই পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প দরিদ্র ভূমিহীন, শ্রমজীবি ও প্রান্তিক চাষীদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে তাদের আত্মনির্ভরশীল করার প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটানো ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প কি?

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ইসলামী ব্যাংকের ব্যতিক্রমধর্মী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী-যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বিশেষত গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে একটি সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় এনে সহজ শর্তে অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা এবং সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা ও নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করা। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ব্যাংকিং সেবা নিয়ে ব্যাংক শাখার চারদিকে ২০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত গ্রামের ভূমিহীন ও দরিদ্র মানুষের ঘরে পৌঁছে থাকে। এ কাজে নিয়োজিত ফিল্ড অফিসারগণ গ্রামের দরিদ্র মানুষের প্রতি ৫ জনের একটা গ্রুপ এবং সর্বোচ্চ ৮ টি গ্রুপ নিয়ে একটা কেন্দ্র তৈরি করে। সদস্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে ও সকলের সুবিধাজনক নির্ধারিত স্থানে মিলিত হয়ে প্রকল্পের নিয়ম-কানুন ও প্রাত্যহিক জীবনের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনসমূহ নিয়ে আলোচনা হয় এবং তা বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা ফিল্ড অফিসারগণ সরেজমিনে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে খোঁজ-খবর নেন। প্রত্যেক সদস্যের নামে ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খোলা হয় এবং সপ্তাহে কমপক্ষে ১০/- টাকা ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও ২/- টাকা কেন্দ্রীয় ফান্ড হিসাবে জমা করে যা সদস্যপদ ত্যাগের সময় লাভসহ ফেরত নিতে পারে। এভাবে ৪ সপ্তাহ চলার পর সকল সদস্যকে পর্যায়ক্রমে বিনিয়োগ প্রদান করা হয়। প্রথমবার সর্বোচ্চ ১৫,০০০/- টাকা দেয়া হয়, যা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে কেন্দ্র সভার মাধ্যমে আদায় করা হয়। খাত ভিত্তিক বিনিয়োগের সীমা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। ২১ টি কৃষিখাতে (ধান, গম, রবি শস্য, বিভিন্ন তরকারী ও শাক-সব্জি উৎপাদন ইত্যাদি) এবং ৩৪৩ টি অকৃষি খাতে (তৈরি ও প্রক্রিয়াজাত, সেবামূলক, বিভিন্ন ব্যবসা, বিভিন্ন দোকান, ফেরী, পশু পালন, নার্সারী,মৎস্য চাষ প্রভৃতি) বিনিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে। বিনিয়োগের কিস্তি খেলাপী না হলে এক কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ রিবেট প্রদান করা হয় এবং পরবর্তী বছর বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। প্রথম দু'বছর পর সফল সদস্যদেরকে চাহিদা সাপেক্ষে করজে হাসানায় (বিনা লাভে-কেবল মূল টাকা ফেরৎ) বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য টিউবওয়েল এবং স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপনের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। তিন বছর অতিক্রমের পর যাদের বাড়িতে টিনের ঘর নেই তাদেরকে টিনের ঘর নির্মাণে বিনিয়োগ দেয়া হয়[১]।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য

দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে একটি বিশেষ সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় এনে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদেরকে দরিদ্রতার নিষ্পেষণ হতে মুক্তির লক্ষ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা এবং পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি টেকসই স্বনির্ভর কর্মসূচী গড়ে তোলা।

---

[১] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পল্লী উন্নয়ন বার্তা, জুলাই- সেপ্টেম্বর- ২০০৫

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের সম্প্রসারণ কার্যক্রম ১৯৯৫ থেকে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত

সাল	শাখার সংখ্যা	জেলা সংখ্যা	ইউনিয়ন সংখ্যা	গ্রাম সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	মহিলা সদস্যের হার	পুঞ্জিভূত বিনিয়োগের পরিমাণ (মিলিয়ন)	বিনিয়োগ স্থিতি (মিলিয়ন)	আদায় হার	সঞ্চয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন)	টিউব ওয়েল বিতরণ (বিনা লাভে)	স্যানিঃ ল্যাট্রিন বিতরণ (বিনা লাভে)
১৯৯৫	২০	১৭	১৭৫	২০	১৯৪০	৫২%	১.৯০	--	১০০%	০.১৯	–	--
১৯৯৬	২০	১৭	১৮০	২০	৩৩৩৫	৫৫%	১৮.৪৮	৯.৯৪	১০০%	০.৯১	–	–
১৯৯৭	৩২	২৭	১৯০	৬৩	৮১৯০	৬২%	৬০.৩৫	২৭.০১	৯৯%	৩.৫০	২২৪	১০০
১৯৯৮	৪৫	৩৩	২০১	২৫৮	১৫১৩৫	৭৫%	১৩১.৮৬	৪৯.৪৪	৯৯%	৭.৯৯	৩০৫	১৭৫
১৯৯৯	৫২	৩৮	২৩০	১০৬২	৪১১১৫	৮৭%	৩২৬.৭৪	১৪০.৩০	১০০%	২২.৯৭	৫০৪	২৭১
২০০০	৬৯	৪৫	৪৮১	১০৬৫	৭৪৩১৫	৯১%	৭১৪.৯৩	২৭২.৬০	৯৯%	৫৬.০৫	৮৫০	৪০০
২০০১	৬৯	৪৫	৪৮১	২২১৪	১০০৪৭০	৯৩%	১৩২৩.৮৭	৩৭১.০৯	৯৮%	৯৯.০৭	১২০০	৫৫০
২০০২	৭৩	৪৮	৫৪০	২৮৭৫	১০৭২২৫	৯৩%	২০২৯.৬৭	৪৩২.০৬	৯৮%	১৬৬.৮৩	১৮৯৪	৭১১
২০০৩	৮৩	৫০	৬৫৬	৩৭০০	১৩৩৪৬৫	৯৪%	২৯২৩.৫৯	৫৫৭.৯৭	৯৮%	২২৮.৭৪	২৫৩৯	৯৭৭
২০০৪	৯০	৫৪	৭২৯	৪২৩০	১৬৩৪৬৫	৯৫%	৪২১৬.৭৭	৭৮৯.৯৭	৯৯%	৩২৩.১০	৩৪০০	১৫০৯
২০০৫	১০১	৫৭	৭৮১	৪৫৬০	২১৭৪৪৫	৯৪%	৬০৩৩.২৯	১১০৬.৪৭	৯৯%	৪৫৯.০৬	৪৪২১	২২০৪
২০০৬	১১৮	৬১	৯০৬	৮০৫৭	৪০৯৪৩০	৯২%	৯৩০০.০৫	২২৪২.২২	৯৯%	৭২.২২৪	৫৫২২	৩১৩৯
২০০৭	১২৯	৬১	৯২৬	১০০২৩	৫১৬৭২৫	৯২%	১৩৯৬১.০১	২৮৮৪.৬৬	৯৯%	১০৫৩.৫৬	৬২৪২	৩৫৫১

প্রাপ্ত তথ্য ও বিশ্লেষণ

সমস্যাবলী

বিনিয়োগ গ্রহীতাদের দিক থেকে সমস্যা

ক্রমিক নং	সমস্যার ধরন	বিনিয়োগ গ্রহীতা	শতকরা হার
১.	শরীয়ত সম্মত বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব	৮০	৮০%
২.	অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিকতা ও অধিক স্বাক্ষর	৬০	৬০%
৩.	বিনিয়োগ পরিশোধের পদ্ধতি	৫০	৫০%
৪.	বাধ্যতামূলক স্বাক্ষর	৪০	৪০%
৫.	অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ	৭৮	৭৮%
৬.	প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব	৩০	৩০%
৭.	ব্যাংক নির্ধারিত খাতে বিনিয়োগ ব্যবহার	৭০	৭০%
৮.	সামাজিক বাধা	৫০	৫০%
৯.	প্রতি সপ্তাহে মিটিং-এ উপস্থিত সংখ্যা	৬০	৬০%
১০.	গ্রুপ লিডারের অতিরিক্ত মানসিক চাপ	২৫	২৫%
১১.	স্বামীর অসুস্থতা	২০	২০%
১২.	মুনাফা লাভের পূর্বেই কিস্তি পরিশোধ	৭০	৭০%
১৩.	নিয়মিত সঞ্চয় পরিশোধ	৩০	৩০%
১৪.	বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে সময় ক্ষেপণ	২৮	২৮%

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরাসরি টাকা প্রদান না করে পণ্য দ্রব্য ক্রয় করে দিয়ে থাকে। ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকায় বিনিয়োগ গ্রহীতারা পণ্যদ্রব্যের পরিবর্তে টাকা নিয়ে তাদের জরুরী প্রয়োজন পূরণ করতে চায় অথচ শরীয়ত তা অনুমোদন করে না। ৮০% বিনিয়োগ গ্রহীতা জানালেন এটা একটি বড় সমস্যা ।

২. অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিকতা ও অধিক স্বাক্ষর ঃ পল্লী অঞ্চলের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত। একবার বিনিয়োগ পেতে তাদের ১৮ বার স্বাক্ষর করা লাগে এবং অধিক আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করতে হয় । ৬০% বিনিয়োগ গ্রহীতা এ সমস্যার কথা জানালেন।

৩. বিনিয়োগ পরিশোধ পদ্ধতি ঃ বিনিয়োগ গ্রহীতাদের প্রতি সপ্তাহে লাভ সহ কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। কোন কোন সময় তাদের আয়ের অপ্রতুলতা ও পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যার কারণে প্রতি সপ্তাহে কিস্তি পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। ৫০% বিনিয়োগ গ্রহীতা এটাকে একটি বিশেষ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

৪. বাধ্যতামূলক স্বাক্ষর ঃ বিনিয়োগ গ্রহীতাকে বিনিয়োগ গ্রহণ করতে বাধ্যতামূলক স্বাক্ষর প্রদান করতে হয়। সুতরাং অশিক্ষিত গ্রহীতাকে বিনিয়োগ নেয়ার পূর্বে স্বাক্ষর করা শিখতে হয়, যা বয়স্ক লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য। ৪০% বিনিয়োগ গ্রহীতা এ সমস্যার কথা বলেন।

৫. অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ ঃ ব্যাংক প্রথমবার মাত্র ৮,০০০ টাকা বিনিয়োগ করে থাকে। দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ৮,০০০ টাকা দিয়ে তেমন কোন ভাল ব্যবসা পরিচালনা করা যায় না। ৭৮% গ্রহীতা জানালেন এটা একটা মারাত্মক সমস্যা।

৬. প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব ঃ এ প্রকল্পের অধিকাংশ বিনিয়োগ গ্রহীতা মহিলা। প্রশিক্ষণ ছাড়া বিনিয়োগের অর্থ নিয়ে হঠাৎ করে ব্যবসা পরিচালনা করা মহিলাদের পক্ষে কখনো কখনো অসম্ভব হয়ে পড়ে। ৩০% মহিলা এ সমস্যার কথা উল্লেখ করেন।

৭. নির্ধারিত খাতে বিনিয়োগের অর্থ ব্যবহার : পল্লী অঞ্চলের মানুষ সব সময় দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে। তাদের অভাব সীমাহীন। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত বিনিয়োগ নগদ টাকায় পেয়ে জরুরী অভাবগুলো পূরণ করতে চায়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক নির্ধারিত খাতে বিনিয়োগ করায় তাদের এ অভাব মেটানো সম্ভব হয় না। ৭০% বিনিয়োগ গ্রহীতা জানালেন এটা একটা বড় সমস্যা।

৮. সামাজিক বাধা ঃ এন.জি.ও সম্পর্কে আমাদের সমাজে একটি নেতিবাচক ধারণা প্রচলিত আছে। এখনও এ সমাজের অনেকেই মনে করে, মহিলাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করা শরীয়ত অনুমোদন করে না। আর এ সমস্ত কারণে মহিলারা ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে কখনো কখনো লজ্জা বোধ করে। ৫০% গ্রহীতা এটাকে একটি সমস্যা মনে করে।

৯. সভায় নিয়মিত উপস্থিতি ঃ স্বাভাবিকভাবে মুসলিম মহিলারা স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাড়ীর বাহিরে যায় না। তা ছাড়া দরিদ্র মহিলারা ঘরের বিভিন্ন কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকে। সুতরাং প্রতি সপ্তাহে মিটিং এ উপস্থিত থাকা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। ৬০% বিনিয়োগ গ্রহীতা জানালেন এটা একটা বিশেষ সমস্যা।

১০. গ্রুপ লিডারের অতিরিক্ত মানসিক চাপ ঃ এ প্রকল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রুপ সিকিউরিটি নেয়া হয়। এরপরও কোন বিনিয়োগ গ্রহীতা কিস্তি দিতে অপারগ হলে অথবা দেশ ছেড়ে অন্য কোন দেশে চলে গেলে গ্রুপ লিডার ও ডেপুটি গ্রুপ লিডারকে সমস্যায় পড়তে হয়। ২৫% গ্রহীতা জানালেন এসমস্যার কথা।

১১. স্বামীর অসুস্থতা ঃ গ্রামের মহিলারা স্বামীর উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে এবং স্বামী তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় ও অন্যান্য কাজে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাদের স্বামী কোন কারণে অসুস্থ হলে বিনিয়োগের কিস্তি পরিশোধে সমস্যা দেখা দেয়। ২০% গ্রহীতা তাদের এ সমস্যার কথা বলেন।

১২. মুনাফা অর্জনের পূর্বেই কিস্তি পরিশোধ ঃ বিনিয়োগ গ্রহণের পর ২১ দিন বা ২ সপ্তাহ অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ১ সপ্তাহ পর থেকেই লাভ সহ কিস্তি পরিশোধ করতে হয়।[২] ব্যবসা থেকে এক সপ্তাহ পর মুনাফা অর্জন করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। সুতরাং ১ সপ্তাহ পর থেকে কিস্তি পরিশোধ করা একটি সমস্যা, জানালেন ৭০% বিনিয়োগ গ্রহীতা।

১৩. নিয়মিত সঞ্চয় পরিশোধ ঃ গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। আর এই দরিদ্রতা যখন তীব্র আকার ধারণ করে তখন সদস্যদের ক্ষেত্রে নিয়মিত সঞ্চয় পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। ৩০% সদস্য জানালেন এ সমস্যার কথা।

১৪. বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে অতিরিক্তি সময় ক্ষেপণ ঃ ৮ সপ্তাহ যাবত নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় ও কেন্দ্র ফান্ড জমা দেয়ার পর প্রতি গ্রুপে ২ জনকে বিনিয়োগ বিতরণ করা হয়।[৩] পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য সদস্যদের পর্যায়ক্রমে বিনিয়োগ বিতরণ করা হয়। সুতরাং সকল সদস্যের বিনিয়োগ পেতে অনেক ক্ষেত্রে সময় ক্ষেপণ হয় । ২৮% সদস্য জানালেন এ সমস্যার কথা।

ফিল্ড অফিসারদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সমস্যা

ক্রমিক নং	সমস্যার ধরন	সংখ্যা	%
১.	শরীয়তের জ্ঞানের অপ্রতুলতা	০৮	৪০
২.	পরিবহণ ব্যবস্থা	১০	৫০

[২]. আরডিএস ম্যানুয়াল, পৃ. ১৮

[৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৩.	ভাষাগত সমস্যা	০৯	৪৫
৪.	বিনিয়োগ গ্রহীতা কর্তৃক অন্য খাতে খরচ	০৮	৪০
৫.	পর্দা পালনে সমস্যা	১১	৫৫
৬.	সামাজিক প্রতিবন্ধকতা	০৬	৩০
৭.	অতিরিক্ত কাজের চাপ	১৫	৭৫
৮.	সুসজ্জিত অফিস না থাকা	০৮	৪০
৯.	বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কম থাকা	১৪	৭০
১০.	আলাদা ক্রয় প্রতিনিধি না থাকা	১১	৫৫
১১.	দক্ষ, সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য সদস্য নির্বাচন করা কঠিন	০৮	৪০
১২.	সীমিত পরিমাণ বিনিয়োগ বিতরণের ক্ষমতা	১০	৫০
১৩.	ওভারল্যাপিং সমস্যা	০৬	৩০

(১) **ফিল্ড অফিসারদের অনেকেই শরীয়ত সম্পর্কে পেশাগত বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকার কারণে ঋণ এবং বিনিয়োগের সুদ-মুনাফার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।** আর এ কারণে তারা টাকার পরিবর্তে পণ্য-দ্রব্য বিতরণের ব্যাপারে সতর্ক থাকে না। ৪০% ফিল্ড সুপারভাইজার এ সমস্যার কথা জানালেন।

(২) **পরিবহণ ব্যবস্থা ঃ** ফিল্ড সুপারভাইজারদের বাইসাইকেল প্রদান করা হয়। প্রতিদিন তাদের ডিউটি পালন করার জন্য অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০ কি.মি থেকে ১০০ কি.মি ও অতিক্রম করা প্রয়োজন হয়, যা বাইসাইকেলে খুবই কষ্টকর। ৫০% ফিল্ড অফিসার জানালেন এটা একটা বিরাট সমস্যা।

(৩) **ভাষাগত সমস্যা ঃ** ফিল্ড অফিসাররা অনেক ক্ষেত্রে নিজের এলাকা থেকে অনেক দূরে বা অন্য অঞ্চলে চাকরি করে। পল্লী অঞ্চলের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত ও কম শিক্ষিত হওয়ার কারণে তাদের ভাষা বুঝতে ফিল্ড অফিসারদের কষ্ট হয়। ৪৫% ফিল্ড অফিসার এ সমস্যার কথা বললেন।

(৪) **বিনিয়োগ গ্রহীতা কর্তৃক অন্য খাতে খরচ ঃ** ফিল্ড অফিসাররা ক্রয় প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করায় অনেক ক্ষেত্রে সময়ের অভাবে ফিল্ড অফিসাররা পণ্য খরিদ না করে সরাসরি নগদ টাকা প্রদান করে থাকে। অভাবী বিনিয়োগ গ্রহীতা এ সুযোগে ব্যাংক-নির্ধারিত খাতে বিনিয়োগ না খাটিয়ে নিজেদের অন্যান্য প্রয়োজন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করে। ফলে তারা যথাসয়ে কিস্তি পরিশোধ করতে পারে না। ৪০% ফিল্ড অফিসার বললেন এটা একটা সমস্যা।

(৫) **পর্দা পালনে সমস্যা ঃ** পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের ৯২% মহিলা সদস্য।[৪] কিন্তু এ প্রকল্পে কর্মরত ফিল্ড অফিসার সবাই পুরুষ। সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধের কারণে পুরুষ অফিসাররা মহিলা সদস্যদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করতে পারেন না। এ কারণে বিনিয়োগ বিতরণ ও উত্তোলন করার ক্ষেত্রে এবং মিটিং পরিচালনায় সমস্যায় পড়তে হয়। অনেক ক্ষেত্রে শরীয়তের ফরয পর্দার বিধান লংঘন হয়। ৫৫% ফিল্ড অফিসার এ সমস্যার কথা জানালেন।

(৬) **সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ঃ** পল্লী এলাকার মহিলারা বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়ম-নীতি মেনে চলেন। যার ফলে ফিল্ড অফিসাররা তাদের কাজ সুন্দরভাবে করতে পারেন না। ৩০% ফিল্ড অফিসার বললেন এটা একটি সমস্যা।

(৭) **অতিরিক্ত কাজের চাপ ঃ** ফিল্ড অফিসারদেরকে ফিল্ড ও ডেস্ক এ দুই ধরনের কাজই করতে হয়। শাখা থেকে ফিল্ড অনেক দূরে হওয়ায় কাজ শেষ করে অফিসে ফিরতে কখনো কখনো বিকেল হয়ে যায় আবার অফিসে এসে টেবিলের কাজ শেষ করতে রাত ৮/৯ টা বেজে যায়। ৭৫% ফিল্ড অফিসার এ সমস্যার কথা জানালেন।

(৮) **সুসজ্জিত অফিস না থাকা ঃ** একই ভবনে কাজ করলেও ইসলামী ব্যাংকের অফিসের মত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের অফিস সুসজ্জিত না থাকায় ফিল্ড অফিসাররা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে এবং কাজের উদ্যম হারিয়ে ফেলে। ৪০% ফিল্ড অফিসার এ সমস্যার কথা জানালেন।

(৯) **বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কম থাকা ঃ** একই যোগ্যতা নিয়ে ব্যাংকের জুনিয়র অফিসার গ্রেড-৩ এ কর্মরত অফিসারের বেতন এবং একজন ফিল্ড অফিসারের বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলক কম। এত অল্প বেতনে বর্তমান বাজারে তাদের পরিবার পরিচালনা করা কখনো কখনো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে তারা কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। ৭০% ফিল্ড অফিসার এ সমস্যার কথা জানালেন।

(১০) **আলাদা ক্রয় প্রতিনিধি না থাকা ঃ** আলাদা ক্রয় প্রতিনিধি না থাকায় ফিল্ড অফিসারদের ক্রয় প্রতিনিধির দায়িত্বও পালন করতে হয়। ফলে তারা অনেক ক্ষেত্রে নিজের পারফরমেন্স দেখাতে পারে না। এর ফলে পণ্য-দ্রব্য ক্রয় না করে বিনিয়োগ গ্রহীতাদের সরাসরি নগদ টাকা বিতরণ করে। এ সুযোগে বিনিয়োগ

---

[৪]. ইসলামী ব্যাংক বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৬

গ্রহীতা ব্যাংক-নির্ধারিত খাতে বিনিয়োগ না করে জরুরী প্রয়োজন মেটায়। এতে শরীয়ত লংঘিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ৫৫% ফিল্ড অফিসার এ সমস্যার কথা জানালেন।

(১১) **দক্ষ, সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য সদস্য নির্বাচন করা কঠিন ঃ** আমাদের দেশে সৎ ও নির্ভরযোগ্য বিনিয়োগ গ্রহীতা নির্বাচন করা অত্যন্ত কঠিন। অথচ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ৪০% ফিল্ড অফিসার জানালেন এটা একটা বিশেষ সমস্যা।

(১২) **সীমিত বিনিয়োগ বিতরণের ক্ষমতা ঃ** ফিল্ড অফিসারদের প্রাথমিক বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষমতা খুবই সীমিত । তারা প্রথমতঃ ৮,০০০/- টাকা, মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০,০০০/- টাকা থেকে ২,০০,০০০/- টাকা বিনিয়োগ দিতে পারে।[৫] বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় এটা খুবই সীমিত অর্থ। ৫০% ফিল্ড অফিসার এ সমস্যার কথা জানালেন।

(১৩) **ওভারল্যাপিং সমস্যা ঃ** অনেক ফিল্ড অফিসার বললেন, অন্যান্য এনজিও অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের সদস্যদের ঋণ প্রদান করে থাকে। এতে কিস্তি খেলাপীর প্রবণতা বেড়ে যায়। এজন্য ইসলামী ব্যাংকের উচিৎ আলাদা ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা। ৩০% ফিল্ড অফিসার এ সমস্যার কথা জানালেন।

সুপারিশমালা

১. ফিল্ড সার্ভে হতে দেখা গেল, ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় সদস্য এবং ফিল্ড অফিসাররা ঋণ (সুদ ভিত্তিক) ও বিনিয়োগ (মুনাফা ভিত্তিক) এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না। এক্ষেত্রে তাদেরকে নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, সেমিনার, আলোচনা সভা ইত্যাদির মাধ্যমে ধারণা প্রদান করতে হবে। তাছাড়া গ্রামের মসজিদের খতীব ও ইমামদের নিয়ে ওয়ার্কশপ ও বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে, যাতে জুমআর খুতবা বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গ্রামের মুসল্লিদের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়। এর ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ প্রচলিত এনজিও ও ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবে এবং সাথে সাথে সুদের খারাপ প্রভাব ও ব্যবসার উপকারিতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

---

[৫]. পল্লী উন্নয়ন বার্তা জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০০৫

২. এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, প্রায় ৮০% বিনিয়োগ গ্রহীতা অপর্যাপ্ত মূলধনের কারণে তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি করতে পারছে না। আরডিএস প্রদত্ত বিনিয়োগ তাদের জন্য পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং এই বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৩. বিনিয়োগ পেতে বিনিয়োগ গ্রহীতাকে বাধ্যতামূলক ১৮ বার সাক্ষর করতে হয়। নিরক্ষর সদস্যদের বিনিয়োগ নিতে স্বাক্ষর করা শিখতে হয়, যা বয়স্ক সদস্যদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে খুবই কঠিন এবং অনেকের জন্য অসম্ভবও। অল্প শিক্ষিত সদস্যদের একবার বিনিয়োগ নিতে ১৮ বার স্বাক্ষর করা এক অস্বস্তিকর ব্যাপার। সুতরাং নিরক্ষর সদস্যদের ক্ষেত্রে টিপসই নিয়ে বিনিয়োগ দেয়া যেতে পারে এবং স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন সদস্যদের ক্ষেত্রে সাক্ষরের সংখ্যা কমিয়ে ১৮ এর স্থলে ২-এ নিয়ে আসা যেতে পারে।

৪. ফিল্ড সার্ভেতে দেখা গেছে, অনেক মহিলা পর্দা লংঘন করে বিনিয়োগ নিতে চায় না। সুতরাং পর্দা নিশ্চিত করে বিনিয়োগ করতে হলে মহিলা সদস্যদের মাঝে কাজ করার জন্য মহিলা ফিল্ড অফিসার নিয়োগ দেয়া দরকার। ফলে বিনিয়োগ গ্রহীতা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে, অপরদিকে পর্দা লংঘনের ন্যায় ফরয বর্জনের পাপ থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে।

৫. গবেষক গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লক্ষ্য করেছেন যে, গ্রুপ মিটিং করার জায়গাটা নিরাপদ ও সজ্জিত নয়। এক্ষেত্রে মহিলা সদস্যরা মিটিং করতে অপ্রস্তুত থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে পর্দার লংঘন হয়। সুরতাং মিটিং এর জায়গাগুলো নিরাপদ ও সুসজ্জিত হওয়া দরকার যাতে সদস্যরা মিটিং এ আসতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে এবং পর্দার বিঘ্ন না ঘটে।

৬. ফিল্ড অফিসাররা জানালেন, তাদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কম হওয়ায় বর্তমান দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় সংসার পরিচালনা করা কঠিন। সুতরাং তাদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা একান্ত ভাবে যৌক্তিক। এ বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে নতুন করে ভাবতে হবে।

৭. বন্যা, দুর্ভিক্ষ, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বাংলাদেশের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কাজেই দুর্গত এলাকার বিনিয়োগ গ্রহীতাদের কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে কখনো কখনো সমস্যায় পড়তে হয়। এসব পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সদস্যদের বিশেষ সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং যারা কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তাদের বিশেষ ছাড় দিতে হবে।

৮. বিনিয়োগ গ্রহীতাদের প্রশিক্ষণ না থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে পারে না। বিশেষ করে গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগি পালন ও মাছের চাষের ক্ষেত্রে সদস্যদের সমস্যায় পড়তে হয়। এক্ষেত্রে সদস্যদের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। তাছাড়া ইসলামী ব্যাংক সম্ভাব্য এলাকাগুলোতে একটা করে হ্যাচারী ও পোল্ট্রি ফার্ম গড়ে তুলতে পারে যেন সদস্যরা প্রশিক্ষণ নিয়ে তাদের এ সকল ব্যবসা দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে পারে। এলক্ষ্যে তাদের জন্য বর্তমানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আরো ব্যাপক করা প্রয়োজন।

৯. পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের অনেক সদস্য অর্থের অভাবে তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা দিতে পারে না। আবার তীব্র অভাবের কারণে অনেক সদস্য ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ারও সুযোগ পায় না। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক এ জাতীয় সদস্যদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি-উপবৃত্তি প্রদান করতে পারে এবং পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে আরডিএস ফ্রি প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করতে পারে। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক এলক্ষ্যে 'আলো' নামে সম্পূর্ণ অবৈতনিক প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং স্কুলের ন্যায় 'আন-নূর' নামে ফোরকানিয়া মক্তব চালু করেছে। এ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ক্রমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে হবে।

১০. ফিল্ড অফিসারদের পদোন্নতির প্রক্রিয়া খানিকটা জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী। এক্ষেত্রে ব্যাংক ফিল্ড অফিসারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাজের দক্ষতা ও অন্যান্য গুণাবলির উপর ভিত্তি করে দ্রুত পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে পারে।

১১. এ প্রকল্পের কাজের পরিমাণ দিন দিন যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে ভাবে নতুন ফিল্ড অফিসার নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। ফলে কাজের পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফিল্ড অফিসার নিয়োগ দেয়া উচিত, যাতে ফিল্ড অফসাররা কাজে মনোনিবেশ করতে পারে এবং সর্বোচ্চ সেবা দিতে পারে।

১২. ফিল্ড সার্ভেতে দেখা যায়, কিছু সংখ্যক বিনিয়োগ গ্রহীতা গোপনে অন্য এনজিও থেকেও ঋণ নিয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক শুধু ঐ সমস্ত সদস্যের বিনিয়োগ দিয়ে থাকে যারা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে না। এ সমস্যার সমাধান করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত একটা ডাটা ব্যাংক গঠন করা এবং সমস্ত ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠনের তথ্য এবং প্রত্যক প্রতিষ্ঠানের ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতাদের প্রোফাইল থাকবে, যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, যাতে কোন সদস্যকে বিনিয়াগ দেয়ার পূর্বে তার সম্পর্কে তথ্য যাচাই বাছাই করা যায়।

১৩. ফিল্ড অবজারভেশনে দেখা গেল, আলাদা ক্রয় প্রতিনিধি না থাকার কারণে ফিল্ড অফিসাররা ক্রয় প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের একান্ত নিজস্ব কাজের চাপের কারণে তারা ক্রয় প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনে অপারগ হওয়ায় বিনিয়োগ গ্রহীতাকে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করে সরাসরি নগদ টাকা সরবরাহ করে। এ সুযোগে বিনিয়োগ গ্রহীতা তার ইচ্ছামত অন্য খাতে বিনিয়োগ ব্যয় করে। এক্ষেত্রে শরীয়ত লংঘন হয়।

১৪. সদস্যরা ৪ সপ্তাহ নিয়মিত সঞ্চয়ের টাকা প্রদানের পর প্রাথমিক বিনিয়োগ নিতে পারে। এ সময় আরও কমিয়ে দেয়া যেতে পারে।

১৫. ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প অন্যান্য এন.জি.ও এর মত সুদভিত্তিক লাভজনক প্রতিষ্ঠান নয়, এটা একটা অলাভজনক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং লাভ ও অন্যান্য চার্জ সহ ১২% এর পরিবর্তে কমিয়ে ৯% এ নিয়ে আসা যায়।

১৬. যে সপ্তাহে বিনিয়োগ দেয়া হয় তার দুই সপ্তাহ পর আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রদানের পরের সপ্তাহ থেকে কিস্তির টাকা আদায় করা হয়।[৬] খুব কম ব্যবসা আছে যেখান থেকে ১ সপ্তাহ পর মুনাফা আসতে পারে অথবা ফসলের ক্ষেত্রে তো মুনাফা আসা আরও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সুতরাং বিনিয়েগের পর বিনিয়োগ গ্রহীতা যাতে মুনাফা অর্জন করে কিস্তি পরিশোধ করতে পারে সে লক্ষ্যে বিভিন্ন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিস্তি আদায়ের ধরন ও সময় বিভিন্ন রকম হতে পারে। কাজেই এ বিষয়টি বিশেষ বিচেনার দাবি রাখে।

১৭. আর.ডি.এস. ৫০ বৎসর বয়সের উর্ধের লোকদের বিনিয়োগ প্রদান করে না অথচ পল্লী অঞ্চলে অধিক বয়সী মানুষের অভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে আরো সহজ শর্তে বিনিয়োগ প্রদান করে বয়স্ক মানুষের কল্যাণে কাজ করা যেতে পারে।

১৮. ভিক্ষুকদের ভিক্ষা বৃত্তি থেকে বেঁচে থেকে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপনের জন্য কর্জে হাসানা দেয়া যেতে পারে। ফলে বেঁচে থাকার সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে যারা ভিক্ষা বৃত্তি বেছে নিয়েছিল তারা ছোট-খাট ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। গ্রামীণ হত-দরিদ্রদের জন্য বর্তমানে কর্জে হাসানা (লাভবিহীন ঋণ) চালু করা হয়েছে।

---

[৬] আরডিএস ম্যানুয়েল, পৃ.১৮

১৯. দেশের প্রশাসন কর্তৃক কিছু কার্যকর উদ্যোগের মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন তথা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণ, গ্যাস সরবরাহ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কর্মের ক্ষেত্রে উন্নয়নে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

উপসংহার

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ব্যাংকিং জগতে ইসলামের অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিমালা বাস্তবায়নের মহান উদ্দেশ্যে পরিচালিত। যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা কুরআন, হাদীস ও ইসলামী শরীয়তের অনুশাসন অনুযায়ী পাচালিত হয় তাকে ইসলামী ব্যাংক বলে।[৭] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামের সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ জীবন ও অর্থনীতিতে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে পল্লী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান, বিপণ্ন ব্যক্তিদের আত্মকর্মসংস্থান, দরিদ্র কৃষক ও বর্গাচাষীদের ভাগ্যোন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প চালু করেছে । বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ আদায়ের হার অত্যন্ত সন্তোষজনক (৯৯%)।[৮] উক্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় গবেষক কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন এবং পাশাপাশি সুপারিশও প্রদান করেছেন। বর্ণিত সুপারিশমালা গ্রহণ করলে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে এ প্রকল্প পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমরা মনে করি।

---

[৭] ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০০৭, পৃ. ১১৪

[৮] পল্লী উন্নয়ন বার্তা, অক্টোবর-ডিসেম্বর- ২০০৭

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮ সংখ্যা-৩২
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১২

গ্রন্থ পর্যালোচনা

নোয়াহ্ ফেল্ডম্যান রচিত : The Fall and Rise of the Islamic State

ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব*
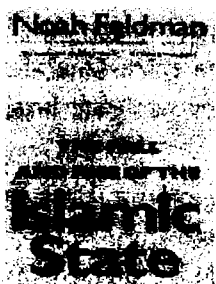
হার্ভার্ড ল' স্কুলের প্রফেসর নোয়াহ্ ফেল্ডম্যান যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি নিউ ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিনের নিয়মিত কলাম লেখক। এছাড়া তিনি মার্কিন কাউন্সিল অন ফরেন রিলেসন্স-এর সিনিয়র ফেলো। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থাবলী হচ্ছে: Divided by God, What We Owe Iraq, After Jihad. ২০০৮ সালে প্রকাশিত তাঁর The Fall and Rise of the Islamic State গ্রন্থটি পাঠকমহলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এতে তিনি সাম্প্রতিককালে মুসলিম বিশ্বে শরীয়া আইন প্রতিষ্ঠার জনপ্রিয় দাবির বিভিন্ন দিক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্যের অনেকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে গণতন্ত্রের জন্য হুমকি মনে করছে। আবার সন্ত্রাসীরা তাদের কর্মকাণ্ডকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে যৌক্তিক বলে চালিয়ে দিতে চায়। নোয়াহ্ ফেল্ডম্যান 'শরীয়া' বলতে আসলে কী বুঝায় এবং ইসলামী বিশ্বে তা কী সুশাসন ও ন্যায়বিচার পুন:প্রতিষ্ঠা করতে পারে-এরূপ প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

নোয়াহ ফেল্ডম্যান ট্রাডিশনাল ইসলামী রাষ্ট্রের আইন কাঠামো ও ঐতিহ্যের আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, সেখানে নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইনী ব্যাখ্যার মধ্যে আলিম সমাজ তথা মুসলিম পণ্ডিতগণ ভারসাম্য বিধান করে চলেন। কিন্তু অটোম্যান শাসকদের হাতে এই ভারসাম্যের অবসান ঘটে; ফলে তার পথ ধরে মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দেয় এবং ভারসাম্যহীন স্বৈরতন্ত্রের উত্থান ঘটে। তিনি মনে করেন, আধুনিক যুগে ইসলামী রাষ্ট্র ও শরীয়া আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে আবার ভারসাম্যপূর্ণ সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বইটি সম্পর্কে 'দি ইকনোমিস্ট' পত্রিকা মন্তব্য করে যে, "ফেল্ডম্যান সাধারণ পাঠকদের জন্য এই ছোট ও মনোরম বইটিতে শত শত বছরের ইসলামী শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যপূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন। একই সঙ্গে তিনি আধুনিককালের রাজনৈতিক ইসলাম ও পুরানো ইসলামী শাসনব্যবস্থার পার্থক্যগুলোও চিহ্নিত করেছেন"। ইকনোমিস্ট পত্রিকার বিবেচনায় বইটি ২০০৮ সালের অন্যতম সেরা গ্রন্থ। বইটি পুরস্কারও জিতে নিয়েছে। বইটি প্রকাশ করেছে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি, প্রেস প্রিন্সটন, নিউজার্সি, পৃ. ১৮৬; মূল্য ১২.৯৫ মার্কিন ডলার।

---

* প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট, ঢাকা।

গ্রন্থটির মূল আলোচনার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। মধ্যপ্রাচ্য ও বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোতে রাজা-বাদশাহ ও স্বৈরশাসকরা স্ব স্ব দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়; ফলে এসব দেশে সংস্কারের ধারণা তীব্র হতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের পতনের পরে পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলো সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, মুসলিম দেশগুলোর সচেতন জনগোষ্ঠি রাজা-বাদশাহ ও স্বৈরশাসকদের হটিয়ে উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। পাশ্চত্যের পণ্ডিতদের কাছে এখন এটি একটি বড় প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে।

ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্র (অটোম্যান সাম্রাজ্য) বিশ্ববীক্ষণ সম্পর্কে পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণার আবর্তে পড়ে উপনিবেশের করালগ্রাসে পতিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মুসলিম বিশ্বকে জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের নামে ভেঙ্গে-চুড়ে বহু জাতি-রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু এসব দেশে আজও স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সরকারগুলো একে একে ব্যর্থ হয়েছে। কেন এমন হলো? অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন, মুসলিম বিশ্বের জনগণের ধারণা হলো, সমাজতন্ত্র ও সেক্যুলারিজমকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করার কারণেই জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলো ব্যর্থ হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সীমিত সংখ্যক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ইসলামের পুনর্জাগরণের ডাক দিয়েছিলেন। তবে সমাজতন্ত্র ও সেক্যুলার জাতীয় রাষ্ট্রগুলো ব্যর্থ হতে শুরু করলে জনগণ বলতে শুরু করে, ইসলামী আদর্শকে একবার সুযোগ দিয়ে দেখা যাক না।

বস্তুত: একমাত্র বিংশ শতাব্দী বাদে বিগত তেরশ' বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্য তথা মুসলিম বিশ্বের শাসন ব্যবস্থায় ইসলামী নীতি ও আদর্শ ছিল মূল চালিকা শক্তি। ইসলামী মতাদর্শ সর্বদা ন্যায়প্রতিষ্ঠার পক্ষে সোচ্চার এবং অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। বিগত তেরশ' বছর ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় যিনিই ক্ষমতায় ছিলেন (তাদের বৈধতার প্রশ্ন থাকলেও) তারা ইসলামী শরীয়া আইনের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। আজকে যারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন, তারা মূলত: ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার কথাই বলছেন। কারণ জনগণ দেখছে, ইসলামী রাষ্ট্রে ছিল 'আইনের শাসন' আর সেক্যুলার রাষ্ট্রে চলছে 'ক্ষমতার' (power) শাসন।

ইসলামী আইনের সূচনা

মহানবী স. ছিলেন একাধারে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা। তিনি আল-কুরআন প্রচার করেন, যাতে বেশ কিছু আইন-কানুনের নির্দেশনা রয়েছে। হিব্রু বাইবেলে এরূপ আইন আরো বেশি রয়েছে। কোন বিষয় নিষ্পত্তির জন্য উপস্থাপন করা হলে মহানবী

স. তাঁর মতামত দিতেন অথবা ওহীর জন্য অপেক্ষা করতেন। মহানবী স.-এর অব্যবহিত কালে পর পর চারজন খলীফা ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন- যাদেরকে 'খুলাফায়ে রাশেদীন' বলা হয়। তাঁরা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা (ঐকমত্য) ও কিয়াসের (গবেষণা) ভিত্তিতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে প্রশ্ন দেখা দেয়, আইনের ব্যাখ্যা কে করবেন? অবশ্য আলিমগণই আইনের ব্যাখ্যা করতেন।

ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্র ও বেশ কিছু ডাইনেস্টি ছিল মৌলিকভাবে বৈধ। ইসলামী রাষ্ট্রে কাযী বা বিচারকগণ আইনের আলোকে বিচার করতেন; তিনি যখন দেখতেন কোন বিষয় আইনে নেই তখন তিনি বিষয়টি জুরী/মুফতীদের নিকট পেশ করতেন। মুফতীগণ ছিলেন বেশ যোগ্য ব্যক্তিত্ব; কারণ ফাতওয়া দেয়ার জন্য কর্তৃত্ব ও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে হতো। অপরদিকে কাযী বা বিচারকগণ সরকারি আদেশে নিয়োগ লাভ করতেন এবং তারা প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও শরীয়া আইনের আওতায় বিচার করতেন। তারা খলীফার নিকট জবাবদিহি করতেন। মুফতীগণ সরকার বা খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন না; তবে তারা আলিম (পণ্ডিত) হিসেবে সমাজে ব্যাপক প্রভাবশালী ছিলেন।

ইসলামী আইন ছিল জুরী তথা আলিমদের আইন অর্থাৎ তারাই আইনের উৎস তুলে ধরতেন। রাষ্ট্র আইন তৈরি করতো না। তবে রাষ্ট্র ঐ আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা করতো। বিচারক বা কাযী খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং সরাসরি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে তাঁরা দায়িত্ব পালন করতেন। বিচারক বা কাযীও আলিমগণের মধ্য থেকে নিযুক্ত হতেন। কাযীরা রাষ্ট্র বা খলীফার আইনগত কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করতেন না। এর মর্ম হলো, বিচারিক কর্তৃত্ব আসতো রাষ্ট্র বা খলীফা থেকে আর আইনের সূত্র ও ব্যাখ্যা আসতো আলিমগণের পক্ষ থেকে। এভাবে খলীফা ও আলিমগণের মধ্যে ক্ষমতার একটি ভারসাম্য বজায় ছিল।

অবশ্য একটি প্রশ্ন ছিল, শাসকরা বিচারকদের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান ছিলেন বিধায় তারা আল্লাহর আইন লংঘন করে বিচারক ও মুফতীদের উপর চাপ দিতে পারতেন। সেক্ষেত্রে কী হতো? ঐতিহাসিকদের মতে, তখন শরীয়া আইনই সংবিধান হিসেবে কাজ করতো। এই সংবিধান কার্যকর ছিল; অবশ্য আলিম সমাজ বা জনসাধারণ কেউই শাসকদেরকে সরকার পরিচালনায় আইন মেনে চলতে বাধ্য করতে পারতো না।

কিন্তু আইন আলিমগণকে এমন কর্তৃত্ব দিয়েছিল যাতে তারা খলীফাকে নিয়োগ বা বরখাস্তকরণে ভূমিকা পালন করতে পারতেন। যেমন:

(১) খলীফার পদটি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোন অধিকার নয়;

(২) খলীফা নির্বাচিত হতেন হয়তো পূর্ববর্তী খলীফার মনোনীত ব্যক্তি, যিনি পরে ইলেক্টোরাল কর্তৃক অনুমোদিত অথবা ইলেক্টোরাল শ্রেণি কর্তৃক নির্বাচিত;

(৩) ইলেক্টোরাল শ্রেণিই নিশ্চিত করতো, মনোনীত ব্যক্তি খলীফা পদের জন্য উপযুক্ত কিনা;
(৪) ইলেক্টোরাল শ্রেণি মনোনীত খলীফার সাথে একটা সামাজিক চুক্তিতে (বায়াত) আবদ্ধ হতেন এবং এর আওতায় তারা আনুগত্যের অঙ্গীকার করতেন;
(৫) সামাজিক চুক্তির (বায়াত) বিনিময়ে খলীফা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিতেন।

সাংবিধানিক শরীয়া আইন সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিল যে, যদি খলীফা ন্যায়বিচার করতে সক্ষম না হন তাহলে তিনি ঐ পদের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন। এক্ষেত্রে আলিমদের অধিকার থাকবে খলীফাকে অযোগ্য ঘোষণা করা। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, অত্যাচারী ও ভ্রষ্ট শাসককে অপসারণ করতে হবে। তবে বাস্তবে আলিমগণ স্বত:স্ফূর্তভাবে কোন খলীফাকে অযোগ্য ঘোষণা করতেন না; কারণ তাদের অধীনে তো কোন সেনাবাহিনী ছিল না যার দ্বারা তারা তাদের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে পারতেন। যা হোক, মধ্যযুগের আলিমগণ উত্তরাধিকার সূত্রে খলীফার পদ গ্রহণ বা ক্ষমতায় আরোহণের নীতিকে প্রত্যাখ্যান করে চলতেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. শরীয়া আইনের সুস্পষ্ট সাহসী ব্যাখ্যা দিয়ে শাসকদের বিরাগভাজন হয়েছেন। এজন্য তিনি কমপক্ষে তিনবার কারাবরণ করেছেন। ১২৯৯ সালে মোঙ্গলরা দামেস্ক আক্রমণ করলে তিনি ফাতওয়া জারী করেন যে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হবে। মোঙ্গলরা ইসলাম গ্রহণ করলেও তিনি তাদেরকে আগ্রাসী আখ্যায়িত করে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য সিরিয়াবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি মনে করেন, যে শাসক শরীয়া আইন অনুসরণ করবে না তার আনুগত্য করা যাবে না। বরং যারা শরীয়া আইনের পরিবর্তে অন্য আইন চালু করতে চায় তাদের প্রতিহত করা মুসলমানদের জন্য জরুরী কর্তব্য।

আইনের সংরক্ষণ : সংকট ও সমাধান

আবু হাসান আল-মাওয়ার্দী The Ordinances of The Government শিরোনামে একটি দলিল প্রণয়ন করেন। এতে তিনি খলীফার দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তার বৈধতার বিষয় আলোচনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, খলীফা যদি নামমাত্র পদে বহাল থাকেন এবং তার নামে অন্য কেউ শরীয়া অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করেন, আল-মাওয়ার্দীর মতে তাকে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেয়া উচিত। এমনকি কোন প্রদেশে যদি কোন ব্যক্তি জোরপূর্বক গভর্নরের পদ দখল করেন এবং তিনি যদি শরীয়া অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করেন তাহলে খলীফার উচিত তাকে বাধা না দেয়া। ইমাম গাযালী এ বিষয়ে আল-মাওয়ার্দীর অভিমতকে সমর্থন করেন। এরূপ মতামতের মাধ্যমে আল-মাওয়ার্দী ও ইমাম গাযালী উভয়েই শরীয়া ও আলিমদের প্রাধান্য বজায় রাখার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন।

এ সকল ইসলামী পণ্ডিতের মতে শাসকের দায়িত্ব হচ্ছে, আইনের আলোকে তার দায়িত্ব পালন করা এবং এর বিনিময়ে তাকে বৈধতা প্রদান করা। তবে প্রশ্ন থেকে

যায়, শাসক যদি তার ক্ষমতাকে এমন যথেষ্ট মনে করেন যে, তার বৈধতার প্রয়োজন নেই তাহলে কী হবে?

আইন-শৃংখলা

ইসলামী পণ্ডিতগণ ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় কিভাবে আইনের বিষয়বস্তুর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতো? তিনটি বিষয় উল্লেখযোগ্য : (১) আত্ম-বিশ্বাসী ও স্বত:প্রণোদিত এই এলিট শ্রেণি আইনকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতো যার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সম্পত্তি বন্টন; (২) আইন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইসলামী পণ্ডিতগণ শাসক কর্তৃক আইনসম্মত কর আরোপ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতো এবং (৩) আইনের উপর ইসলামী পণ্ডিতদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার কারণে তা সরকার পদ্ধতির বৈধতার উপর প্রভাব ফেলতো। আইনের উপর ইসলামী পণ্ডিতদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ফলশ্রুতিতে সার্বিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা, নির্বাহী নিয়ন্ত্রণ ও বৈধতার সহায়ক ছিল।

প্রশাসনিক বিধি-বিধান ও শরীয়া

ট্রাডিশনাল ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকল বিরোধী বিষয়ই ফিকহের নীতির আওতায় নিষ্পত্তি করা হতো না। যেমন- অটোম্যান শাসকরা ওজন ও পরিমাপ, কর আরোপ, ফৌজদারী বিষয়াদি, শাস্তি বিধান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামী পণ্ডিতদের ফাতওয়ার বাইরে প্রশাসনিক বিধি-বিধান জারী করতেন। কোন কোন লেখক মনে করেন, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে শরীয়া আইন কার্যকর হতো না। পাশ্চাত্যের কোন কোন লেখক মন্তব্য করেন, শরীয়া আইন কোন আইনগত ব্যবস্থা (legal system) ছিল না; তারা প্রশ্ন তুলেছেন যে, ইসলামী আইন আদৌ কোন আইন কি না? নোয়াহ মন্তব্য করেন:

"Administrative regulations were derived from the authority and that was recognized by Shariah. A regulation never contradicts or supersedes the Shariah. Regulations were issued and could be applied to fill the gaps and cover those areas where the Shariah did not lay down and mandatory rule. The complex of administrative regulations was subordinate to the authority Shariah".

তিনি এ প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ টেনে আনেন। এরূপ ব্যবস্থায় একজন শাসক বা ইসলামী পণ্ডিতগণ হয়তো ক্ষমতাশালী বা আস্থাভাজন হতেন; তবে এর ফলে জনগণ স্বস্তির সাথে সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিয়োগ করতে পারতো। শাসক পরিবর্তন হলে হয়তো আইন পরিবর্তিত হতো, তবে ইসলামী পণ্ডিতদের ফাতওয়াকে শাসকগণ সম্মান করতেন। এর ফলে আলিমদের প্রতি জনগণের আস্থা বজায় থাকতো। কোন কোন সময় শাসক হয়তো ভিন্ন মাযহাবের অনুসারী হতো, কিন্তু তিনি বিচার-নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অন্য মাযহাবকেও গ্রহণ করতেন।

ইবনে খালদুন বলেনঃ Injustice of the civilization-destroying type can be committed "only by persons who have power and authority". That means the ruler may, violating Shariah can issue administrative regulations.

কখনো কখনো দুনীতিগ্রস্ত ও স্বৈরশাসকরা আলিমদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন ও চুরি করতো এবং নির্যাতন-নিপীড়ন চালাতো। তারা আবার এটাও দাবি করতো যে, তারা যা কিছু করছে তা সবই শরীয়া মোতাবেক করছে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিধি-বিধান আল-কুরআনেই সন্নিবেশিত আছে; এর পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। ইসলামী পণ্ডিতগণ দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ট্রাস্ট-তত্ত্ব (Doctrine of Trust) উদ্ভাবন করেন, যাতে শাসকদের হস্তক্ষেপের সুযোগ ছিল না। তবে দুষ্ট শাসকরা তাতেও হস্তক্ষেপের অপচেষ্টা চালাতো। শাসকরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর হাত দিতে পারতো না; তবে বাণিজ্যিক কর, সম্পূরক কর, যাকাত, ওশর, জিজিয়া, অন্যান্য কর আরোপ করতে পারতো। অবশ্য ইবনে খালদুন অর্থনীতিকে ক্ষতি করতে পারে এরূপ অতিরিক্ত করের বোঝা আরোপের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন। তিনি মনে করেন, বিবেকবান শাসকগণ কর আরোপে সতর্কতা অবলম্বন করেন।

অপরাধীদের শাস্তি বিধানের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য শাসকদের রাজস্ব সংগ্রহ করা দরকার ছিল। তবে শাস্তি বিধানের জন্য অপরাধ প্রমাণের শরীয়া মানদণ্ড কী হবে সেটা একটা সমস্যা ছিল। ইসলামী শরীয়া মোতাবেক চোরের হাত কাটা বা যেনার অপরাধে পাথর ছুড়ে মৃত্যুদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রার সাক্ষ্য প্রয়োজন হয় যা বাস্তবে কদাচিৎ ঘটে থাকে। ইংলিশ কমন ল'-এর ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটতো। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে এ নিয়ে বহু বিভ্রান্তি রয়েছে। অপরদিকে ইসলামী রাষ্ট্রে সাধারণ আইন কার্যকর করার জন্য প্রচুর সরকারি কর্মকর্তা থাকতো। অটোম্যান সাম্রাজ্যে শরীয়া আইনের সম্পূরক হিসেবে প্রশাসনিক আইন দ্বারা অনেক অপরাধের শাস্তি বিধান করা হতো। ইসলামী আইনবেত্তাগণ মনে করেন, ইসলামী বিচারব্যবস্থায় ফৌজদারী মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণের বিষয়টি বিধি-বিধানের আলোকেই নিষ্পত্তি করা হতো। এ কারণেই বহু শাসক ইসলামী আইনবেত্তা (মুফতী)ও আদালতের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

ইসলামী আইনবেত্তাগণ শরীয়া আইনের ব্যাখ্যা করতেন এবং প্রশাসনিক আইনের অনুমোদন দিতেন। তারা অনুভব করেছিলেন, ক্লাসিক্যাল শরীয়া বিধি-বিধান জটিল নগরকেন্দ্রিক সমাজে ফৌজদারী বিবাদের নিষ্পত্তি করার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই তারা প্রশাসনিক বিধি-বিধান জারী করার জন্য অনুমোদন দিয়েছিলেন। এভাবে জটিল জাতি-রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় (Nation-State) ইসলামী আইনবেত্তাগণ নিজেদের গুরুত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। অটোম্যান শাসকগণ গ্রান্ড মুফতী ও অন্যান্য

মুফতীর পদ সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়া বেসরকারি মুফতী তো ছিলেনই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে মুফতীদের সংযুক্ত করে দেয়া হতো। এর ফলে তারা কিছুটা হলেও স্বায়ত্তশাসন হারান। তবে পাশাপাশি একটি রাজকীয় এলিট আলিম/মুফতী শ্রেণি গড়ে ওঠে। অটোম্যান শাসকগণ রোমানদের অনুসরণে সেনাবাহিনী, প্রাসাদরক্ষী, উচ্চশিক্ষিত সাচিবিক কর্মকর্তা ও বিভিন্ন আইন-কানুন চালু করে। শাসকগণ তাদের বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য মুফতীদের সন্তুষ্ট রাখতেন। এভাবে সুন্নী বিশ্বে শরীয়া আইন কার্যকর ছিল।

অটোম্যান সংস্কার

ইসলামী শাসনতন্ত্র থেকে সরে আসার ফলশ্রুতিতে অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়। পর পর তিনটি যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়: গ্রীসের সাথে পরাজয়, নাভারিনোর যুদ্ধে পরাজয় এবং ফ্রান্সের সাথে আলজেরিয়ার পরাজয়। এদিকে মিসরের গভর্নর মোহাম্মদ আলী অটোম্যান সুলতানকে চ্যালেঞ্জ করে বসেন। সুলতান আবদুল মজিদ প্রশাসনে সংস্কারের উদ্যোগ নেন। উল্লেখ্য যে, এক সময় অটোম্যান আমলাতন্ত্র ছিল বিশ্বের সেরা। কিন্তু ষোড়শ শতকের পরে তাতে কোন সংস্কার আনা হয়নি। ওদিকে ইউরোপীয় আমলাতন্ত্র তখন রেকর্ডকিপিং, পরিসংখ্যান ব্যবহার ও কর্ম বিভাজনের সংস্কৃতিতে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। সুলতান আবদুল মজিদ আর্থিক সংকট মেটাতে ইউরোপের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং তাদের সাথে মৈত্রীর হাত বাড়িয়ে দেন। ইউরোপীয়রা অটোম্যান সাম্রাজ্যেকে এতদিন তাদের জন্য বড় হুমকি মনে করতো। উনবিংশ শতকে এসে অটোম্যান সাম্রাজ্য ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে এবং অটোম্যান 'ইউরোপের রোগা লোক' বলে গণ্য হতে থাকে। এতে ইউরোপীয়রা খুশী হয়। তারা অটোম্যান সাম্রাজ্যেকে আর বড় হুমকি মনে না করে তাদের উপর নির্ভরশীল বলে ভাবতে শুরু করে। সুলতান আবদুল মজিদ আর্থিক সংকট মেটাতে ইউরোপের কাছে হাত বাড়ালে তারা নানাবিধ শর্ত জুড়ে দেয় এবং এর মধ্যে আর্থিক খাতের সংস্কার অন্যতম।

তিনি ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেন যা 'তানজিমাত' নামে পরিচিতি লাভ করে। এ কার্যক্রমের আওতায় সামরিক বাহিনী, করব্যবস্থা, সাংবিধানিক ও আইনগত সংস্কার, শরীয়া আইনের কডিফিকেশন ও নতুন কিছু প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১৮৬৯-১৮৭৬ সালের মধ্যে শরীয়া আইনের পরিবর্তে সিভিল আইন কডিফিকেশন করেন যা তুর্কী ভাষায় 'মেসেলে' (Mecelle) এবং আরবীতে 'মাজাল্লা' নামে পরিচিতি লাভ করে। উল্লেখ্য যে, সিভিল আইন কডিফিকেশনে শরীয়ার কিছু বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অপরদিকে শরীয়া আইনের কোন কডিফিকেশন ছিল না; বরং সেগুলো ছিল আইনের তত্ত্ব, নীতিমালা, মূল্যবোধ ও মুফতীদের মতামত। আগে শরীয়া আইনের ব্যাখ্যা করতেন মুফতীগণ। আর সংস্কারের পর সিভিল আইনের ব্যাখ্যা করতেন বিচারকগণ। সিভিল আইন প্রবর্তনের ফলে মুফতীদের পরিবর্তে শাসকের কর্তৃত্ব একচ্ছত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মজার বিষয় হলো, অটোম্যান সাম্রাজ্যের গ্রান্ড মুফতীর নেতৃত্বে অন্যান্য জুনিয়র মুফতীগণ মেসেলের বিরোধিতা করেননি; বরং তাদের নেতৃত্বেই সিভিল আইন কডিফিকেশন সম্পন্ন হয়। তারা শরীয়া আইনকে সকল আইনের উৎস হিসেবে গণ্য না করে কিছু কিছু শরীয়া আইনের বিধান মেসেলে-তে অন্তর্ভুক্ত করেন। বলাবাহুল্য যে, সিভিল আইন কডিফিকেশনে পাশ্চাত্যের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। সিভিল আইন কডিফিকেশন মুফতীদের পতনের জন্য ছিল শেষ পেরেক। এর মানে হলো, সুলতানের সংস্কার কার্যক্রমের ফলে মুফতীদের প্রভাব খর্ব হয়ে যায়, সরকারের বিভিন্ন অঙ্গে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় এবং সেক্যুলার ও স্বৈরতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। আইন আধা-স্বাধীন মুফতীদের প্রভাব থেকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে নিপতিত হয়। মুফতী তথা আলিম সমাজ মেসেলের বিরোধিতা করে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকি নিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। তারা সুলতানের ইচ্ছার সাথে সুর মিলায়। তারা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় যে, এ ব্যবস্থা তাদের চূড়ান্ত পতন ডেকে আনতে যাচ্ছে। বিংশ শতকে মুসলিম দেশগুলোতে এভাবে স্বৈরশাসকদের উত্থান ঘটে।

সাংবিধানিক পরিবর্তন

সিভিল আইন কডিফিকেশনের পর মুফতীদেরকে ঐ আইন ব্যাখ্যা করার জন্য সরকারিভাবে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে তাদের ভূমিকা গৌণ হয়ে যায়; কারণ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত বিচারকরা তাদের অবস্থান দখল করে নেয়। আধুনিক বিচারকগণ মনে করতে থাকেন, আইন এখন আর ধর্ম থেকে আসছে না; বরং রাষ্ট্রই এখন আইনের উৎস। অবশেষে মুফতীদের অবস্থান শুধু পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে তারা মতামত দিতে থাকেন। এর সাথে রাষ্ট্র পরিচালনার কোন সম্পৃক্ততা ছিল না। ১৮৩৯ ও ১৮৫৬ সালে উর্ধ্বতন আমলারা এমন দু'টি দলীল প্রণয়ন করে পাশ্চাত্যের রাজনীতিকদের এমন ধারণা দেন যে, সুলতান এখন আর কারো মুখাপেক্ষী নন, তার জারীকৃত প্রশাসনিক আদেশ তিনিই দিতে পারেন। ১৮৩৯ সালে আপীল আদালত হিসেবে কাজ করা এবং আইন প্রণয়নের জন্য সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করা হয়। এর সদস্যগণ ছিলেন অনির্বাচিত। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো। ১৮৬৭ সালে এই কাউন্সিলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়: (১) আইন বিভাগ ও (২) আপীল আদালত। এরূপ বিভক্তির ফলে মুফতীগণ সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে আরো দূরে ছিটকে পড়েন। ১৮৭৬ সালে আইনসভার দু'টি কক্ষ সৃষ্টি করা হয়: (১) সিনেট ও (২) চেম্বার অব ডিপুটিজ। আদালতকে ক্ষমতা দেয়া হলো বিচারক ও কর্মচারী নিয়োগের এবং তাদের যোগ্যতা আইন দ্বারা নির্ধারণ করে দেয়া হলো। বিচারকরা দেখতে পেলেন তারা এখন শুধুই সুলতানের কর্মচারী। এ সময় আরেকটি কাজ করা হলো। শরীয়া সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিষ্পত্তির জন্য শরীয়া ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। এভাবে শরীয়া সংক্রান্ত বিষয়গুলো একেবারে গৌণ হয়ে পড়ে। ১৮৭৬ সালে প্রথম লিখিতভাবে একটি সাংবিধানিক দলীল প্রণয়ন করা হয়। এরূপ দলীল

ছিল মুসলিম বিশ্বে এই প্রথম। এরূপ লিখিত সংবিধান প্রণয়নের মধ্য দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের পতনের সূচনা হয়। নতুন সংবিধানে খলীফাকে মুসলিম উম্মাহর রক্ষক বিবেচনা করে 'সুপ্রীম' হিসেবে গণ্য করা হয়। সংবিধানে ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়। এভাবে সংবিধান 'সুপ্রিম' হিসেবে গণ্য হয় এবং ইসলাম হয়ে পড়ে 'অধীনস্থ' (subordinate)। উল্লেখ্য যে, সংবিধান জনগণের নামে নয়, সুলতানের ফরমান হিসেবে জারী করা হয়। এতে সুলতানকে 'খলীফা' বলে সম্বোধন করা হয়; কিন্তু এটুকু ব্যতীত ইসলামের আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। এমনকি সংবিধানের কোথাও 'আল্লাহ'-কে স্বীকৃতি দেয়া হলো না। এটা কোনভাবেই ইসলামী সংবিধান ছিল না; বরং এটা ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য-প্রভাবিত যেখানে সুলতানই ছিলেন সর্বেসর্বা।

নতুন পার্লামেন্ট

নতুন সংবিধানকে আধুনিক মনে করা হলেও তা কোনভাবেই গণতান্ত্রিক ছিল না; সার্বভৌমত্ব ছিল সুলতানের। অথচ এই সংবিধানের আওতায় মুসলিম বিশ্বে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য ধরনের পার্লামেন্ট সৃষ্টি করা হয়। পার্লামেন্ট সদস্যদের মতামত প্রকাশ ও ভোট প্রদানের স্বাধীনতা দেয়া হয়। তবে কোন বিল সুলতানের অনুমোদন ব্যতীত পাস করা যেতো না। সুলতান উচ্চকক্ষের সদস্যদের আজীবনের জন্য মনোনয়ন দিতেন। নিম্নকক্ষের সদস্যরা প্রতি ৫০ হাজার ভোটারের প্রতিনিধি হিসেবে চার বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন। নতুন সংবিধানকে ইউরোপের রাজা শাসিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত মনে হচ্ছিল, যেখানে জনপ্রতিনিধিরা ওহীর পরিবর্তে আইন প্রণয়নকারী হিসেবে আবির্ভূত হন। এর অনুসরণে মুসলিম বিশ্বে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ হতে শুরু করে। উল্লেখ্য যে, অটোম্যান সুলতানের এ সকল সংস্কার কার্যক্রম সত্ত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তার পরাজয় ঠেকানো যায়নি। বৃটিশ ও ফরাসীরা সুযোগ পেয়ে অটোম্যান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ভূখণ্ড নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়।

ব্যালান্স অব পাওয়ার

ট্রাডিশনাল ইসলামী সংবিধান শাসক ও পণ্ডিতদের মধ্যে ভারসাম্য বিধান করতো। অটোম্যান সুলতান ইউরোপ থেকে আধুনিকতা আমদানী করতে চাইলেন এবং এজন্য শরীয়া পরিত্যাগ করা দরকার হলো। তরুণ অটোম্যানরা ভাবলো, তাদের কাঙ্ক্ষিত আধুনিকতার পথে প্রতিবন্ধক হলো শরীয়া। সুলতান বুঝতে পেরেছিলেন যে, নির্বাহী ক্ষমতা হ্রাসের বিনিময়ে আইনসভা ক্রমান্বয়ে নিজ ক্ষমতার বলয় বৃদ্ধি করছিল। ১৮৭৭ সালে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্য দিয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সরকারের সমালোচনা, মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৮৭৮ সালে আইনসভার প্রথম অধিবেশন বসে। সুলতান হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন যে, আইনসভা কাজ করতে থাকলে তাঁর অবস্থান ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকবে। তিনি অবিলম্বে আইনসভা ও সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেন। ১৯০৮-০৯ সালের আগে আইনসভা আর পুনর্বহাল হয়নি। সুলতান অবশ্য আইনসভা ও সংবিধান বাতিল করে

শরীয়া আইনে ফিরে যাননি। মেসেলে ও অন্যান্য আইন বহাল রইলো। তিনি মুফতীদেরকেও আর তাদের পুরনো মর্যাদায় ফিরিয়ে আনেননি। তিনি বরং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হন। এভাবে তিনি ৩০ বছর তার শাসন অব্যাহত রাখেন যা ইতিহাসে অপশাসন নামেই পরিচিত। স্বৈরশাসক সুলতান আবদুল হামিদ আর্মেনিয়ানদের বিরুদ্ধে গণহত্যাও চালান। তিনি অবশেষে কামাল পাশার নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতাচ্যুত হন। সুলতান যে আইনসভা ও সংবিধান বাতিল করেছিলেন এবং মুফতীদের হটিয়েছিলেন কামাল তা আর ফিরিয়ে আনেননি। বরং তার স্থলে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। ট্রাডিশনাল ইসলামী রাষ্ট্রে শরীয়া আইন ও প্রশাসনের মধ্যে যে ভারসাম্য বজায় ছিল কামাল পাশা তা আর ফিরিয়ে আনেননি। বরং তার আমলে রাষ্ট্র একটি সর্বেসর্বা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

আইনপ্রণেতাদের রাষ্ট্র ও শরীয়া

কামাল পাশা তুর্কী জাতীয়তাবাদ ও সেক্যুলার বৈপ্লবিক মতাদর্শের আলোকে শাসন পরিচালনা শুরু করেন। তিনি ১৯২৪ সালে খলীফা পদবী ও খিলাফত ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন। কেবল তুর্কীদের সমন্বয়ে তুরস্ক নামক সীমিত ভূখণ্ডে সাবেক অটোম্যান সাম্রাজ্য নিজ অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করে। যারা তুর্কী ভাষায় কথা বলতো শুধু তাদেরকেই তুর্কী বলে গণ্য করা হতে থাকলো। সুখের কথা যে, তুরস্ক নিজে কখনো উপনিবেশের অধীনে শাসিত হয়নি। কামাল পাশা নিজ উদ্যোগে দেশটিকে ইউরোপীয় আদলে পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেন। তিনি ইসলামী শরীয়াকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করেন যা বিগত ১৩০০ বছরে কেউ করেনি। তিনি ইসলামকে কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাস হিসেবে গণ্য করতে অনুমতি দেন। তিনি তুরস্কের অবনতির জন্য ইসলামকে দায়ী করেন এবং রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায় থেকে ইসলামকে বিতাড়ন করেন। সেক্যুলার বৈপ্লবিক মতাদর্শের প্রতি পাশ্চাত্য তাঁকে উৎসাহ দিতে থাকে। তাঁর আমলে রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায় থেকে ইসলামী পণ্ডিত ও আলিমগণ একেবারে উৎখাত হয়ে যায়।

আরবীভাষী মিসরেও প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটে। এখানে ঔপনিবেশিক প্রভুদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠে একদল আইনজীবি যারা ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। এদের উৎসাহে সেখানেও ইউরোপীয় ধ্যানধারণার বিকাশ ঘটে। এখানে ১৯৩৬-১৯৪২ সময়কালে বিশিষ্ট ইসলামী পণ্ডিত আবদ-আল-রাজ্জাক আল-সানহুরীর নেতৃত্বে শরীয়া আইনের পরিবর্তে তুরস্কের আদলে ইসলামী ও পাশ্চাত্য প্রভাবিত সিভিল ও ফৌজদারী আইনের সমন্বয়ে বিস্তারিত বিধিবদ্ধ আইন (Comprehensive Legal Code) তৈরী করা হয়। এদের দেখাদেখি অন্যান্য আরব দেশগুলোও তা অনুসরণ করে। মিসরে আলিমদের রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায় থেকে তুরস্কের চেয়েও কড়াভাবে উৎখাত করা হয়। তারা শুধু পারিবারিক আদালতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন। মিসরে শরীয়া আইনকে আর রাষ্ট্রের আইনের উৎস হিসেবে গণ্য করা হলো না।

ইরাকে ১৯২৫ সালে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে তার আওতায় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। গঠিত হয় নির্বাচিত আইন পরিষদ। ইরাকে পারিবারিক বিষয়াদি নিষ্পত্তির জন্য ধর্মীয় আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভারত উপমহাদেশেও রাজতন্ত্রের আওতায় শরীয়া আইন শুধু পারিবারিক বিষয়াদিতে সীমাবদ্ধ করা হয়। এখানেও উপনিবেশিক প্রভুরা প্রভাব খাটাতে থাকে। এমনকি পারিবারিক আদালতগুলোও পরিচালিত হতো আধুনিক প্রশিক্ষিত বিচারকদের দ্বারা। বিভিন্ন দেশে গ্রান্ড মুফতীর পদ বিলুপ্ত করা হয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে ফাতওয়া দেয়ার কাজও প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে তুরস্ক ও সুন্নী আরব দেশগুলোতে আলিম ও ইসলামী পণ্ডিতগণ নিছক ধর্মীয় নেতায় পরিণত হন; রাষ্ট্রীয় তথা পার্থিব বিষয় থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। আলিমগণ মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন যে, তারা নিজেদেরকে শুধু ধর্মীয় কাজের উপযোগী ভাবতে থাকেন। পাশ্চাত্য ও সেক্যুলার মুসলিমরা আলিমদের সম্পর্কে এমন ধারণা দিতে থাকে যে, তারা পার্থিব বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন। নোয়াহ ফেল্ডম্যান এ প্রসঙ্গে বলেন,

The Shariah was classically understood as religious in origin and orientation, yet simultenously directed toward the governance of ordinary behavior through legal norms. The scholars were not merely men of religion but also men of the world, some of them took responsibility of applying the Shariah.

এদিকে সৌদি আরবে ব্যতিক্রম পরিস্থিতি ঘটে। এখানে কোন না কোনভাবে শরীয়া আইন বহাল রাখা হয়। আলাদাভাবে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রে তুরস্কের মত লিখিত সংবিধান তৈরী হয়নি। শিয়া প্রভাবিত ইরানেও আলিমদের প্রভাব বজায় থাকে।

নির্বাহী কর্তৃত্ব

অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ ছিল, সরকারের নির্বাহী কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণে ভারসাম্য বিধানের যে ব্যবস্থা ছিল তার অবসান ঘটানো। একইভাবে এ সাম্রাজ্যের পতনের পর যে সকল মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে সেগুলোতেও ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফত ব্যবস্থা পুর্নবহাল না করে প্রেসিডেন্ট বা সামরিক শাসকরা ক্ষমতায় জেঁকে বসে। জামাল আবদুন নাসের মিসরে রাজা ফারুককে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। একই ঘটনা ঘটে সিরিয়া, লিবিয়া, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ায়। অবশ্য মরক্কো ও আলজেরিয়ার রাজতন্ত্র কোনক্রমে টিকে যায়। এসব দেশে সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা বিভাগ আধা-সামরিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে শাসন কর্তৃত্ব চালাতে থাকে। এসব স্বৈরশাসক জনগণের সম্পদ লুট করতে থাকেন এবং পাশ্চাত্যের ধনী দেশগুলোর সাথে গাঁটছড়া বেঁধে তাদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করেন। নোয়াহ প্রশ্ন তুলেন, এসকল রাষ্ট্র কেন গণতান্ত্রিক আইনসভার মত প্রতিষ্ঠান বা বিকল্প কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারলো না? এর জবাবও দিয়েছেন নোয়াহ:

"---displacement of Shariah Law and decline of scholarly class made a vacuum for replacement of balance the executive."

"Though people were unhappy with the despotic executives, but in absence of scholarly class nobody raised voice against the rulers." In absence of Shariah Law and scholars, Arab societies lost the collective imaginative capability of substantial organized resistance to the power of the state. Not that Arab or Islamic political norm is distinctively obedient or oriented towards recognition of power. In fact, countries of government through law, legitimated by law betray this cultural analysis."

আধুনিক মতাদর্শ হিসেবে ইসলাম

বিংশ শতক ইসলামী আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে এরূপ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন রাজনৈতিক-ধর্মীয় আন্দোলন শুরু হয়। ১৯২৮ সালে মিসরে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম ব্রাদারহুড। ট্রাডিশনাল আলিমদের নেতৃত্বে নয়; বরং পাশ্চাত্য শিক্ষিত মুসলিমদের নেতৃত্বে ইখওয়ানুল মুসলিমীন গঠিত হয়। এর নেতৃত্ব বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় হতাশা প্রকাশ করে ইসলামী আদর্শের আলোকে সকল ব্যবস্থা পুনর্গঠনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। অন্যদিকে শিয়া ইরানের আলিম সমাজের নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

আধুনিককালের ইসলামী রাষ্ট্রের আন্দোলনকারীরা অন্যান্য মতবাদ যেমন সমাজতন্ত্র, কম্যুনিজম বা জাতীয়তাবাদী আদর্শের মত সাংবিধানিক পদ্ধতিতে বিদ্যমান রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করে আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা যে ইসলামী রাষ্ট্র কাঠামোর কথা বলছে তা এখন লিখিত বই-পুস্তকে পাওয়া যায়, যা আগে ছিল আলিমদের সামষ্টিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আকারে অলিখিত। ইসলাম একটি কঠোর ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার কথা বলে। এক শ্রেণীর পেশাদার পণ্ডিত ও কর্মী ওহীর আলোকে আইন প্রণয়ন ও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে সমাজ পরিবর্তন করতে চান। ব্রাদারহুড নেতারা হারানো ইসলামী সমাজ ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করছেন। কিন্তু এরা আলিম ও ইসলামী পণ্ডিত তথা মুফতীদের ট্রাডিশনাল মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করছে বলে প্রতীয়মান হয় না। দেখা যাচ্ছে যে, এখন ট্রাডিশনাল আলিমরা এমন হীনমন্যতায় ভুগছেন যে, তাদেরকে যথাযথ মর্যাদা দেয়া হচ্ছে না।

ব্রাদারহুড একটি ব্যাপকতর সংগঠন যাদের কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা সংক্রান্ত এবং এমনকি খেলাধুলা পর্যন্ত। তাদের কার্যক্রম থেকে সাধারণ মানুষের ধারণা জন্মেছে যে, ইসলামী আইন আধুনিক যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক চাহিদা পূরণে সক্ষম। ইসলামের ইতিহাস থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, যুগে

যুগে ইসলামের বিকৃতিরোধ ও অপসংস্কৃতি সংস্কারে বিভিন্ন মনীষীর আগমন ঘটে। আরব অঞ্চলে এরূপ ব্যক্তি এসেছিলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব। আধুনিক যুগে যারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছে তাদের সাথে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের চিন্তাধারার অনেক মিল রয়েছে। এ কারণে হয়তো বর্তমান সৌদি সরকার এসব সংগঠনের প্রতি সমর্থন দিয়ে থাকে।

আধুনিক যুগের ইসলামী আন্দোলনগুলো মনে করে, শুধু আলিমগণই নন; যে কোন আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিও কুরআন অধ্যয়ন করে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা দিতে পারেন। কেউ কেউ মনে করেন, আলিমদেরকে রাষ্ট্রীয়কাজে জড়িত না করাই ভালো। আবার কারো কারো মতে তাদেরকে পারিবারিক আইন ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার কাজে সম্পৃক্ত রাখা যেতে পারে। অবশ্য ব্রাদারহুডের লোকেরা আলিমদেরকে ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে। তবে তাদেরকে সেই ইসলামী খেলাফত যুগের ন্যায় প্রাধান্য পুনরুজ্জীবনের পক্ষপাতি বলে প্রতীয়মান হয় না। তবে তাদেরকে উপদেষ্টা পরিষদের ভূমিকায় রাখার ব্যাপারে কারো হয়তো আপত্তি নেই। তাদের যুক্তি হচ্ছে, আধা-সেক্যুলার সংবিধানের আওতায় আলিমদেরকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের দায়িত্ব দেয়া হলে তাদের পক্ষে তা সম্পাদন করা কঠিন হবে এবং সেটা হবে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে সীমিত জ্ঞানের আলিমদেরকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল; কিন্তু তাতে খুব বেশি সুফল পাওয়া যায়নি।

ইসলামপন্থীদের শরীয়া ও ইসলামী শরীয়াঃ ন্যায়বিচারের প্রশ্ন

ইসলামপন্থীরা মনে করেন, ইসলাম হচ্ছে এমন একটি মতাদর্শ যা সরকার ও সমাজ সংস্কারের জন্য যথেষ্ট। ইসলাম হচ্ছে এমন একটি ইঞ্জিন যা দ্বারা মুসলিম উম্মাহকে আবার বিশ্বে ক্ষমতার আসনে বসানো যায় এবং প্রভাবশালীও হওয়া যায়। তাদের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্র, যাকে ইসলামী আইন ও ইসলামী মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হবে। অপরদিকে সাইয়েদ কুতুবের ভাষায় 'ইসলামী স্পিরিট' ট্রাডিশনাল ইসলামী সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ইবনে তাইমিয়া রাজনীতিকে ইসলামী আইনের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। 'ইসলামী মূল্যবোধ' পরিভাষাটিও রাষ্ট্রের আধুনিক ভিশনের সাথে জড়িত বিষয়, যা ছিল ট্রাডিশনাল ইসলামী রাষ্ট্রের আইনগত বৈধতার সাথে সম্পর্কিত।

ইসলামী আইনের ধারণার সাথে আধুনিককালের ইসলামপন্থীদের সম্পর্ক একটু জটিল ও অস্পষ্ট। রাজনৈতিক বিবেচনায় জনপ্রিয়তা লাভের জন্য সহজেই ইসলামী আইনের কথা বলা যায়; আবার এজন্য তাদেরকে বিরুদ্ধবাদীরা একটু ভয়ের চোখেও দেখে থাকে। আমরা জানি, মুসলিম সমাজগুলোতে নির্বাহী ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় ইসলামী আইনের অবসানের সূচনা হয়েছিল। মুসলমানগণ লক্ষ্য করেন যে, আধুনিককালের স্বৈরশাসকদের তুলনায় ক্লাসিকাল ইসলামী রাষ্ট্র অনেক ভালো ছিল।

সুতরাং ইসলামী আইনের পুনরুজ্জীবনের আহ্বান মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে আকর্ষণীয়ই হবে।

বর্তমানকালে ইসলামপন্থীরা ন্যায়বিচার (জাস্টিস) কথাটিও বেশ জোরে শোরে বলে থাকেন। ন্যায়বিচার বলতে তারা বুঝাতে চান সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনগত ন্যায়বিচার। ইসলাম যথার্থ অর্থেই 'ন্যায়বিচার' নিশ্চিত করার কথা বলেছে। সাইয়েদ কুতুব তাঁর 'মাইলস্টোন' (ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা) ও 'ইসলামে সামাজিক সুবিচার' গ্রন্থে ন্যায়বিচার-এর ধারণা তুলে ধরেছেন। অনেক সময় রাজনৈতিক বিতর্ক বা নিপীড়ন এড়ানোর জন্য 'সামাজিক সুবিচার' পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। 'রাজনৈতিক ন্যায়বিচার' বলতে তারা একটা ন্যায়বাদী সরকারকেই বুঝিয়ে থাকেন। 'আইনগত ন্যায়বিচার' বলতে আইনের শাসনকে বুঝানো হয়। তবে এ বিষয়ে কতগুলো সমস্যা দেখা দেয়; যেমন- শরীয়া আইনের পাশাপাশি সম্পূরক আইন প্রণয়ন, আইন-কানুনকে হালনাগাদ করা, মৃত্যুদণ্ডের বিধান, পারিবারিক আইন ও সাংবিধানিক আইনের মধ্যে সমন্বয় বিধান ও শরীয়া ব্যাখ্যার জন্য আলিমদের মর্যাদার পুনরুজ্জীবন।

শরীয়ার গণতন্ত্রায়ন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আধুনিককালের ইসলামপন্থীরা আলিমদের মর্যাদার পুনরুজ্জীবন করতে আগ্রহী নয়। বরং তারা সত্যিকার অর্থে ইসলামী আইন প্রণয়ন করতে চান এবং পেশাদারদের মাধ্যমে তার বাস্তবায়ন করতে চান। এটা অনেকটা মিসরের সানহুরী কর্তৃক সম্পাদিত আইনের কডিফিকেশনের মত যা ইসলামী আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; তবে তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হবে আধুনিক পেশাদারী লোকদের যারা আলিম নন। এখানে বড় প্রশ্ন দেখা দেয় যে, শরীয়া আইনের ব্যাখ্যা কে করবে?

আধুনিককালের ইসলামপন্থীদের ধারণা অনুযায়ী তারা বিধিবদ্ধ ইসলামী আইনের খসড়া তৈরী করবে। কেননা তাদেরই ইসলামী আইনের উপর বিশেষায়িত জ্ঞান ও দখল রয়েছে। তবে এতে তাদের সমস্যা হলো, আইনের মূল উৎস ওহী (Divine Source) অনুসন্ধান ও আইনের কর্তৃত্ব নির্ধারণে তাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইনের উপর আলিমগণ পূর্ণাঙ্গ দখল রাখেন। তাদের ব্যাখ্যা আবার রাষ্ট্র ও আইনের চোখে গ্রহণযোগ্য। অপরদিকে আইনের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা যাদের আছে তাদের ভূমিকা বিবেচনায় রেখেও একটি প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায় তা হলো: কিভাবে ও কেন ইসলামী আইন দ্বারা জনগণ শাসিত হবে? বিগত শতাব্দীতে অধিকাংশ ইসলামী সাহিত্যে এ বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

গণতন্ত্রের উত্থান

মুসলিম দেশগুলোতে জনগণ যদি নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে তাহলে তারা ইসলামপন্থীদেরকেই পছন্দ করবে বলে প্রতীয়মান হয়। ইসলামপন্থীরা গণতন্ত্রের

জন্য যেমন শ্লোগান দেয়, তেমনি অনেক সময় তারা নিজেদের মধ্যে গণতন্ত্রের অনুসরণও করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে: ইসলাম ও গণতন্ত্র কী একে অপরের পরিপূরক? আরো প্রশ্ন হলো- আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও জনগণের সার্বভৌমত্ব এর মধ্যেই বা সম্পর্ক কী? ইসলামী আন্দোলনের মূলধারাগুলো শরীয়া ও গণতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয়শীলতা মেনে নিয়েছে। অবশ্য সমন্বয়ের পদ্ধতি নিয়ে মতপার্থক্য দেখা যায়। তবে প্রধান ধারার প্রস্তাবনা হচ্ছে, জনগণের সার্বভৌমত্ব নয়; বরং আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান ও আইন প্রণয়ন করা। এখানে ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণার সাথে এই মিল রয়েছে যে, উভয়ই মনে করে আল্লাহ্ যা নির্দেশনা দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করতে হবে। সুন্নীরা মনে করেন, ইসলামী রাষ্ট্রের আইনসভা শরীয়ার সাথে সঙ্গতি রেখে বা শরীয়াকে আইনের উৎস মনে করে আইন পাস করবে। এর অর্থ দাড়াচ্ছে, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত আইনসভা শরীয়াকে গণতান্ত্রিক নীতিমালায় বাস্তবায়ন করবে এবং তারাই আইনের (শরীয়ার) ব্যাখ্যা করবে। এরূপ পদ্ধতিতে আলিমদের ভূমিকা থাকবে না।

এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, গণতান্ত্রিক শরীয়ার কর্তৃত্ব/কর্তৃপক্ষ কে হবে? যদি আলিমগণ আইনসভাকে মেনে নিতে রাজী না হন? যদি আইনসভা ভ্রান্তপথে চলে তা হলে কী হবে?

শরীয়ার সাংবিধানিকীকরণ

যদি আইনসভা সরল বিশ্বাসে এমন আইন পাস করে যা শরীয়া সম্মত নয় তাহলে কী হবে? ইসলামের শেষ নবী বলেছেন : 'আমার উম্মত কোন ভুলের উপর একমত হবে না'। আরো বলা হয়েছে : 'আলিমগণ কোন ভুলের উপর একমত হবে না'। সাম্প্রতিককালের কয়েকটি দেশের সংবিধানে যেমন, ইরাক (২০০৫) ও আফগানিস্তানে (২০০৭) এরূপক্ষেত্রে আইনসভার অনুমোদিত আইন বিচার বিভাগ কর্তৃক রিভিউ করার বিধান রাখা হয়েছে। এর মানে হলো বিচারকগণ আলিমদের মত ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা করবেন যদিও বিচারকগণ আলিম নন। আরো লক্ষ্যণীয় যে, বিচারক নিয়োগে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের প্রভাব থাকবে।

ইসলামপন্থীদের সাংবিধানিক মডেল সম্ভাবনাময় নাকি অকার্যকর? নিম্নলিখিত কারণে ইসলামপন্থীদের সাংবিধানিক মডেল সম্ভাবনাময় বলে অনেকে মনে করেন:

প্রথমত : আইন প্রণয়নের দায়িত্ব পূর্বেকার আলিমদের পরিবর্তে আইনসভার উপর ন্যস্ত হওয়ায় এটি ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

দ্বিতীয়ত : গণতান্ত্রিক শরীয়া চালু করার ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের মূল ব্যবস্থায় ফিরে আসার সুযোগ পাওয়া গেলো।

তৃতীয়ত : এপদ্ধতি গণতান্ত্রিক কাঠামোতে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনরুজ্জীবনের সুযোগ এনে দিয়েছে।

আবার কারো কারো মতে, নিম্নলিখিত কারণে ইসলামপন্থীদের সাংবিধানিক মডেল নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করে থাকেন :

প্রথমত : এটি মূলত: রাজনৈতিক ও আইনগত সংস্কারের সরল-ফ্যান্টাসি;

দ্বিতীয়ত : এতে প্রচুর ধারণার সমাবেশ হলেও প্রয়োজনীয় নির্দেশনার অভাব রয়েছে:

তৃতীয়ত : এতে আধা-বিচারিক (কোয়াসি-জুডিশিয়াল) ক্ষমতার উত্থান ঘটবে;

চতুর্থত : এই নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাথে নতুন প্রজন্মের পরিচিতির জন্য যুগের পর যুগের প্রয়োজন হবে:

পঞ্চমত : প্রস্তাবিত নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠানের পারফরমেন্স প্রত্যাশা অনুযায়ী নাও হতে পারে।

যে কোন নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনে রাজনৈতিক সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রতি সমর্থনদানের জন্য সমর্থকের প্রয়োজন হবে। সমাজের সবচেয়ে আলোকিত লোকদেরকে নিয়োগ করতে হবে উপযুক্ত পদে। যাই হোক, আলিমদের অনুপস্থিতিতে শরীয়া আইন কোন ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা ও কাঠামোর উপর দাঁড়াতে পারবে না।

ইরানের ব্যতিক্রমী উদাহরণ

ইরাক ও আফগানিস্তানের সংবিধানে ইসলামী আইনের বিচারিক রিভিউয়ের উদাহরণ পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানে রাখা হয়েছিল। তবে এর আগে ১৯০৬-০৭ সালে ইরানের আলিমদের সক্রিয় অংশগ্রহণে যে সংবিধান প্রণীত হয়েছিল তাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এ সংবিধানের খসড়া প্রণয়নে পাশ্চাত্যের হস্তক্ষেপ বা প্রভাব ছিল না এবং এ সংবিধানের স্থায়িত্ব বেশি দিন ছিল না। তবে ইরানে ইসলামী সংবিধান প্রণয়নে আলিমদের ভূমিকা, ইসলামী আইনের বিচারিক রিভিউয়ের ব্যবস্থা, তাদের স্বল্প স্থায়িত্বের সংবিধান, পরবর্তীতে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে আলিমদের ক্ষমতায় আরোহণ সুন্নী দেশগুলোর উদাহরণ থেকে ভিন্নধর্মী। সুন্নী বিশ্বে আলিমদের অবস্থান যেভাবে নি:শেষিত হয়েছে শিয়া বিশ্বে সেরূপ ঘটেনি।

ইরানের সাংবিধানিক ইতিহাস বিশেষত: ১৯০৫-১১ এবং তৎপরবর্তী ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবের ইতিহাস পর্যালোচনার জন্য শিয়া মতবাদের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক তত্ত্ব অনুধাবন করতে হবে। শিয়া ও সুন্নী মতবাদের মধ্যে মৌলিক কিছু বিষয়ে মিল থাকলেও কতিপয় ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্ন ও ঐতিহাসিক ঘটনায় মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শিয়া ও সুন্নী মতবাদের মধ্যে সাংবিধানিক প্রশ্নে প্রধান পার্থক্য হলো ইসলামের শেষ নবীর উত্তরাধিকার নির্ধারণ। এ ব্যাপারে সুন্নীদের অবস্থান হলো, সমাজের সবচেয়ে যোগ্য ও উত্তম ব্যক্তিকে আলিমদের সম্মতি নিয়ে নেতা হিসেবে নির্বাচন করা। আলিমদের মতামতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তাদের মতামতের ভিত্তিতে নেতাকে বৈধতা দেয়া। পক্ষান্তরে শিয়াদের মতে মুহাম্মদ স.-এর রক্ত সম্পর্কের ধারাকে মেনে নিয়ে উত্তরাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। তাদের মতে মহানবী স.-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা আলী রা., তারপরে তাঁর পুত্র হুসাইন রা. এবং তাঁর বংশধারা হচ্ছেন উত্তরাধিকার সূত্রে ইসলামী উম্মাহর নেতা। তারা মনে করেন, উত্তরাধিকার সূত্রে ইসলামী উম্মাহর এসকল নেতা হচ্ছেন আল্লাহর মনোনীত ইমাম এবং মূলধারার শিয়াদের মতে দ্বাদশ ইমাম হচ্ছেন শেষ ইমাম যিনি এখনো

গুপ্ত অবস্থায় আছেন। শিয়াদের এই মতবাদ অনুযায়ী গুপ্ত ইমামই সকল বিষয়ে সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকারী; তবে তাঁর অনুপস্থিতিতে ঐ দায়িত্ব আলিমদের উপর বর্তায়। লক্ষ্যণীয় যে, সুন্নী আলিমদের চাইতে শিয়া ইমামদের মর্যাদা অনেক উপরে। তবে শিয়া গুপ্ত ইমামের অনুপস্থিতিতে শিয়া আলিমদের মর্যাদা ও ভূমিকা সুন্নী আলিমদের চাইতে একটু বেশি বলে মনে হয়।

শিয়া ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ যাই হোক, তারা কিন্তু ইতিহাসের হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বেশিদিন থাকতে পারেনি। মধ্যযুগে সুন্নী মতবাদের তুলনায় শিয়া সাংবিধানিক মতবাদ খুব বেশি প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ করতে পারেনি। মিসরের ফাতেমী বংশ শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেও তা সুন্নীদের থেকে বিশেষ কোন ব্যতিক্রমধর্মী ছিল না। অবশ্য ইরানে সাফাভীদ শাসকরা বারো ইমামের ধারণাকে গ্রহণ করলে শিয়া মতবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় হতে থাকে। তারা প্রায় ২৫০ বছর ধরে শিয়া মতবাদ অনুযায়ী তাদের শাসন অব্যাহত রাখেন। সুতরাং গুপ্ত শিয়া ইমামের অনুপস্থিতিতে আলিমদের ভূমিকা পালনের তত্ত্ব ইরানে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে।

ইরানে শিয়া মতবাদ বিকাশের পিছনে পারস্যের ইসলাম-পূর্ব যুগের শক্তিশালী আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিরাট প্রভাব ছিল। এখানেই শিয়া আলিমদের মধ্যে আমলাতান্ত্রিক ক্রমধারার একটি প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব বিকশিত হয়েছে। একজন মোল্লা থেকে শুরু করে তা ক্রমান্বয়ে 'আয়াতুল্লাহ' পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ইরাকের নাজাফ ও কারবালা থেকে যে শিয়া আলিমদের বিকাশের ধারা শুরু হয়েছিল বিংশ শতকে তা ইরানের কোম নগরীতে এসে চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। শিয়া মতবাদে 'মুজতাহিদ' হচ্ছেন আলিমদের মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ের যারা ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা রাখেন। সুন্নী মতবাদে একই ধরনের 'মুফতী' রয়েছেন যারা ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা রাখেন। আল-মাওয়ার্দীর মতে, ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফার এমন যোগ্যতা থাকতে হবে যিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় হবেন শীর্ষস্থানীয়। যদিও সুন্নী বিশ্বে এমন খলিফা ছিল কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। আরো মজার বিষয় হলো, সুন্নী বিশ্বে এমন ধারণাও রয়েছে যে, গবেষণা করে স্বাধীন মতামত দেয়ার (ইজতেহাদ) দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য আশির দশকে এসে ইসলামী আইনের গবেষকরা এই মতামতের শুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। শিয়া বিশ্বে অবশ্য এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। বরং শিয়া আলিমগণ আগের চেয়ে আরো বেশি মাত্রায় আস্থাশীল হয়েছেন যে, তারা ওহীর শুধু বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যাই নয়, তারা এর দার্শনিক ব্যাখ্যাও দিতে সক্ষম।

লক্ষ্যণীয় যে, মধ্যযুগের ইসলামী দর্শন সুন্নী বিশ্বে বিশেষ ভাবে বিকশিত না হলেও শিয়াদের হাতে গ্রীক দর্শনের বিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে। আজও কোমের মাদ্রাসায় মধ্যযুগের ইসলামী দর্শন ও সমসাময়িক দর্শনগুলো পাঠ্যসূচির অংশ হিসেবে পড়ানো হয়। আজও শিয়া আলিমগণ বেশ আত্মবিশ্বাসী যে, তারা নিজেরাই ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা রাখেন। আরো লক্ষ্যণীয় যে, শিয়া

আলিমগণ সুন্নীদের মত আইনগত ব্যাখ্যার চাইতে দার্শনিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বকে সামনে রেখে মতামত দিয়ে থাকেন। যেমন ২০০৩ সালে ইরাকের সবচেয়ে প্রভাবশালী শিয়া আলিম আয়াতুল্লাহ সিস্তানী সেদেশের সংবিধান রচনার সময় এই মর্মে বিবৃতি দেন যে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সংবিধান রচিত হতে হবে। তাঁর বিবৃতিটি ছিল এক পৃষ্ঠারও কম। তিনি তাঁর মতের পক্ষে কোন সূত্র উল্লেখ না করে বরং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক তত্ত্বকে বিবেচনায় রেখে নিজস্ব যুক্তিবোধকে প্রয়োগ করেন।

এই পটভূমিতে ১৯০৫-১১ সালে ইরানের সাংবিধানিক বিপ্লবের সময়কালের শিয়া আলিমগণের ভূমিকা আলোচনা করা যেতে পারে। এসময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন ছিল যে, উনবিংশ শতকে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর চক্রান্তের ফলে মুসলিম বিশ্ব একে একে নানা বিড়ম্বনায় পতিত হচ্ছিল; ইরান বহু কষ্টে উপনিবেশ হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তবে রাজতন্ত্র পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এসময়ে ইরান অর্থ সঙ্কটে পতিত হলে পাশ্চাত্যের দেশগুলো থেকে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। যে কোন দেশে অভ্যন্তরীণ সঙ্কট দেখা দিলে সাংবিধানিক সংস্কারের বিষয়টি জরুরী হয়ে দেখা দেয়। দেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছিল, ব্যবসায়ীরা সরকারের আরোপিত করের বোঝা বহন করতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল এবং মধ্যবিত্তরা হতাশ হয়ে পড়েছিল। এসময়ে জনরোষ প্রবল হচ্ছিল। গণআন্দোলন দানা বাঁধতে থাকলে আলিম সমাজও এগিয়ে আসেন। তারা সংস্কারের একগুচ্ছ দাবি তুলে ধরেন যাতে ইসলামী আইনের সংস্কার ছিল অন্যতম। এ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ইরানে একটি লিখিত সংবিধান তৈরি হয়।

ইরানের এই লিখিত সংবিধান ছিল আলিমদের জন্য একটি আত্মত্যাগী বিজয়। আত্মত্যাগ এজন্য যে, এর মাধ্যমে আইন ব্যাখ্যার ব্যাপারে আলিমদের যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছিল তা খর্ব হয়; তবে শাসকদের ক্ষমতাকে আরো বেশি খর্ব করে। এসময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক দেখা দেয়: এই লিখিত সংবিধান কী শরীয়াকে ভঙ্গ করলো? শরীয়া নীতির ভিত্তিতে এই দু'টো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কী সমন্বয় বিধান সম্ভব? অথবা এরূপ একটি প্রতিকূল পরিবেশে যেখানে গুপ্ত ইমামের অনুপস্থিতিতে শরীয়া আইন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, সেখানে একটি লিখিত সংবিধান মন্দের ভালো হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে? সংবিধানের আওতায় আলিমদের নিয়ে একটি কর্তৃপক্ষ (Authority) গঠনের ব্যবস্থা রেখে এসব প্রশ্নের সমাধান দেয়া হয়। শীর্ষ আলিমদের নিয়ে গঠিত এই পরিষদ আইনসভার অনুমোদিত আইন রিভিউ করে দেখবে যে, তা শরীয়া আইনরে সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর যে সংবিধান রচিত হয় তাতে শীর্ষ আলিমদের নিয়ে যে অভিভাবক পরিষদ গঠন করা হয় তা ১৯০৫ সালের সংবিধানের এই দৃষ্টান্ত থেকেই নেয়া হয়েছিল ।

১৯০৫ সালের সংবিধানে অভিভাবক পরিষদ গঠনের ধারণাটি ছিল বেশ সুদূরপ্রসারী। হতে পারে এতে ছিল প্লেটোর রাজনৈতিক তত্ত্বের (Philosopher King)

অনুসরণ অথবা আলিমদের ভূমিকাকে লিখিত সংবিধানের আওতায় আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়া। অপরদিকে একে পাশ্চাত্যের স্টাইলে জুডিশিয়াল রিভিউ ব্যবস্থার অনুসরণ বলা যাবে না; কারণ সে সময়ে একমাত্র বেলজিয়াম ছাড়া পাশ্চাত্যের অন্য কোন দেশের সংবিধানে জুডিশিয়াল রিভিউ ব্যবস্থা ছিল না। বিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে জুডিশিয়াল রিভিউ ব্যবস্থা সংযোজনের পর এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলেও তা এখনো ব্যাপকতা লাভ করেনি। সুতরাং এটা নিশ্চিত যে, ইরানের অভিভাবক পরিষদ বা জুডিশিয়াল রিভিউ ব্যবস্থা কোন দেশ থেকে ধার করা নয়; বরং তাদের নিজস্ব উদ্ভাবন। ইরানের আলিমগণ তাদের ভূমিকাকে সংবিধানিক কাঠামোর আওতায় নিয়ে এসেছিল মাত্র। যাই হোক, রাজনৈতিক বিবেচনায় ১৯০৫-১১ সালে ইরানের সাংবিধানিক বিপ্লব ছিল ব্যর্থ; কারণ কাযার রাজবংশ ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ঐ সংবিধানকে অবজ্ঞা করেছে। এরপর পাহলভী রাজবংশ ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত একইভাবে সংবিধান বিশেষ করে জুডিশিয়াল রিভিউ ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেয়নি।

আলিমগণের শাসন

ইরানের সাংবিধানিক ইতিহাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সেখানকার শিয়া আলিম সমাজ সুন্নী বিশ্বের আলিমদের চাইতে অনেক বেশী মর্যাদাবান ছিলেন, যদিও এধারা সব সময় এক রকম ছিল না। শাহের শাসনামলে আলিমদেরকে অনেকটা হেয় করে রাখা হয়েছিল।

ইরানের শাহ তুর্কস্কের কামাল পাশার মতই দেশকে পুরোপুরি সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। কামাল পাশা সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত করতে যতটা সফল হয়েছিলো, ইরানের শাহ ততটা পারেননি। কারণ তুরস্কের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ইরানের আলিমগণ তা মেনে নেয়নি। সেখানে প্রতিবাদ উত্থিত হয়েছিল। আলিমগণ শাহের পতন চেয়েছিলেন। এমনকি শীর্ষ আলিমগণ নির্বাসিনে চলে গিয়েছিলেন। ইমাম খোমেনী গ্রেফতার হন এবং ১৯৬৩ সালে ইরাকে চলে যান। সেখানেও তাকে থাকতে দেয়া হয়নি; তিনি ফ্রান্সে চলে যান এবং ১৯৭৯ সালে বিপ্লব সফল হওয়া পর্যন্ত সেদেশে ছিলেন। ইরানে শাহের সেক্যুলার প্রচেষ্টা শুধু শহুরে লোকদের প্রভাবিত করেছিল। আলিমদের সক্রিয় ভূমিকার কারণে শহরের বাইরে তা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তুরস্কের আলিমদের ভূমিকা ছিল নিস্ক্রিয়। ইরানে শাহের দুর্বলতা উন্মোচিত হয়ে গেলে সেক্যুলার বুদ্ধিজীবি ও কম্যুনিস্টরাও আলিমদের সাথে আন্দোলনে যোগ দেয়। আলিমদের সাথে দরিদ্র মানুষের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। আয়াতুল্লাহ খোমেনী ছিলেন গরীবদের প্রতি অতিদরদী।

বিপ্লবের পরে সেক্যুলারপন্থীরা ভেবেছিল যে, তারা আলিমদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে; কিন্তু ইমাম খোমেনীর ইমেজ ও জনসমর্থন কম্যুনিস্টদের বিতাড়নের কাজ সহজ করে দিয়েছিল। আবার সমাজতন্ত্রের পতনও তার জন্য অনুকূল ছিল। এরপর ইমাম খোমেনী 'বেলায়েতে ফকীহ'-র দর্শনকে ইরানের সংবিধানের প্রধান উপজীব্য করেন। গুপ্ত ইমামের অনুপস্থিতি আলিমদের উপর দায়িত্ব বর্তিয়েছে-এ

বিশ্বাসের অনুবর্তী হয়ে সরকারের দেখভাল করার নীতি অনুযায়ী ইরানের আলিমরা রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষ্যণীয় যে, ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রে আলিম ছিল নির্বাহী বিভাগের সাথে ভারসাম্য বিধানকারী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ইরানে ১৯৭৯ সালের পর আলিমগণ নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হন। এর ফলে নির্বাহী বিভাগের উপর ভারসাম্য বিধানকারী আর কোন প্রতিষ্ঠান রইলো না। ইরানের ইসলামী সরকারের আওতায় মৌলিক স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। মূলকথা হচ্ছে, সাংবিধানিক সরকারের অধীনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আলিমদের উপস্থিতি আছে কি নেই সেটি মূখ্য বিষয় নয়; বরং আলিমগণ ভারসাম্যবিধানকারী বিকল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন কিনা সেটিই আসল বিষয়। বস্তুত: ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় শরীয়া একটি কার্যকর ব্যবস্থা (টুল) হিসেবে কাজ করতে পারে; কিন্তু অন্যান্য ব্যবস্থার মতই সেটিকে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসা জরুরী। আফগানিস্তানে তালেবানরা অর্থাৎ আলিমগণ কোন প্রকার ভারসাম্যবিধানকারী বিকল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়াই ক্ষমতায় এসেছিল। তবে তাদের মধ্যে উঁচু দরের আলিম তেমন ছিল বলে মনে হয় না। মাদ্রাসার ছাত্ররাই আলিম বলে পরিচিতি লাভ করেছিল।

সৌদি আরব: একটি ব্যতিক্রম

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সৌদি আরব হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রয়েছে। দেশটির আলিম সমাজ শাসন বিভাগের সাথে একটা ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছেন। একথা দ্বারা এটা বুঝানো হচ্ছে না যে, অন্যান্য সুন্নী দেশগুলো যদি সৌদি আরবের মত একই ধারা অব্যাহত রাখতো তা হলে তারাও ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ ও ঐতিহ্য বজায় রাখতো। সৌদি রাজনৈতিক ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বিরাট দূরত্বে অবস্থান করছে। এমনকি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র থেকেও তারা ভিন্নতর। সৌদি রাজনৈতিক ব্যবস্থা বুঝতে হলে দু'টো বিষয়কে বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রথমত: তেল সম্পদের প্রাচুর্য এবং দ্বিতীয়ত: সৌদি আলিমদের উচ্চতর মূল্যবোধ সুন্নী বিশ্বের আলিমদের থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্নতর। সৌদি শাসকরা অন্যান্য আরব দেশগুলোকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, রাষ্ট্রে আলিমদের ভারসাম্যবিধানকারী ভূমিকা বহাল রেখে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা অব্যাহত রাখা যায়।

সৌদি আরবের রাজনৈতিক ব্যবস্থা আলোচনার জন্য ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। তুরস্কের উসমানীয় শাসকরা আরব উপকূলের পশ্চিমের হিজাজ এলাকার মক্কা ও মদীনার উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিল। তারা দূরবর্তী পূর্ব উপকূলের নজদের প্রতি গুরুত্ব দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ ও বিংশ শতকে নজদ এলাকায় সউদ বংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। উসমানীয় শাসকরা এই এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের উপরও কোন হস্তক্ষেপ করতো না। তবে ১৮০২ সালে ইবনে সউদের নেতৃত্বে এক বাহিনী মক্কা, মদীনা ও পশ্চিম উপকূলের উপর তাদের

নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য তুরস্কের উসমানীয় শাসকরা সেনাবাহিনী প্রেরণ করলে ১৮১৮ সালে সৌদিরা পরাজিত হয় এবং ফলশ্রুতিতে সৌদি নেতাদের নির্বাসনে পাঠনো হয় এবং একজন রাজপুত্রকে ইস্তাম্বুলে শিরোচ্ছেদ করা হয়। কয়েক যুগের ব্যবধানে সৌদি রাজবংশ পুনরায় নজদের উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। দুই দফায় নজদ এলাকায় সৌদি রাজবংশ তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে; যদিও আধুনিক অর্থে তাকে রাষ্ট্র বলা যায় না।

সৌদি রাজবংশের উথান সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে ইতিহাসের আরেকটি বিষয়ের দিকে তাকাতে হবে। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে সৌদি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ ইবনে সউদ এবং প্রখ্যাত আলিম ও সংস্কারক মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের মধ্যে এক সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে সমঝোতার মধ্য দিয়ে সৌদি আরবের পরবর্তী ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে। ইবনে সউদ ছিলেন একজন উপজাতীয় সামরিক নেতা। তিনি এলাকার পর এলাকা জয় করতে ভালোবাসতেন। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর তিনি তাঁর চিন্তা ও মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চেতনার সমন্বয় ঘটিয়ে প্রতিপত্তি অর্জনের পথে দ্রুত এগিয়ে যান। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব আরবের জনগণকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা তথা শিরক, কুসংস্কার ও বিদআত পরিহার করার এবং মহানবী স.-এর সুন্নাহ অনুসরণের আহ্বান জানান। আবদুল ওয়াহাবের বিরোধিতাও ছিল। শিয়া, সুফীবাদী ও মাযারপন্থীরা তাঁর মতবাদকে পছন্দ করেনি। সৌদি শাসকদের সহায়তায় আবদুল ওয়াহাব শিরক উচ্ছেদের জন্য মাযারগুলোকে ধ্বংস এবং বিদআতী অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেন।

আবদুল ওয়াহাবের সংস্কার কর্মসূচি সৌদি শাসকদের সমর্থন লাভ করায় তারা তাদের শাসন কার্যে এক ধরনের বৈধতা পেয়ে যান। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো সৃষ্টি করতে না পারলেও অবশেষে উভয়ের সম্মিলিত প্রয়াসে সাংবিধানিক অবকাঠামোর আওতায় একটি আধুনিক রাষ্ট্রের পত্তন ঘটাতে সক্ষম হন। এই দুই নেতার তিরোধানের পরে তাদের উত্তরাধিকারীরা তাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়। ১৯০২ সালে আবদুল আজিজ ইবনে সউদ রিয়াদ পুন:দখল করে আরব উপদ্বীপের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৫ সালে তিনি মক্কা ও মদীনার শাসক হোসেন ইবনে আলীকে উৎখাত করে হিজাজ দখল করেন এবং সৌদি আরব নামে একটি আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। হোসেন ইবনে আলী 'মক্কার শরীফ' হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন বৃটেনের ঘনিষ্ঠ মিত্র। বৃটিশ মেজর লরেন্সের প্ররোচনা ও সহযোগিতায় তিনি তুর্কী খিলাফতের বিরুদ্ধে আরব জাতীয়তাবাদকে উস্কে দিয়ে বিদ্রোহ করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কী খিলাফতের পতন ঘটলে

বৃটিশরা উপহার হিসেবে মক্কার শরীফ হোসেনের পরিবারকে ইরাক, ট্রান্স জর্ডান, সিরিয়া ও হেজাজে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়। ১৯২৪ সালে তুর্কী খিলাফতের পতন ঘটিয়ে মোস্তফা কামাল পাশা তুরস্কে একট সেক্যুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং অপরদিকে শরীফ হোসেন নিজেকে আরব ও মুসলিম বিশ্বের বাদশাহ হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু এক বছরের কম সময়ের ব্যবধানে ১৯২৫ সালে আবদুল আজিজ ইবনে সউদ মক্কা ও মদীনা দখল করতে সক্ষম হন। এর মধ্য দিয়ে 'মক্কার শরীফ' এর পতন ঘটে।

লক্ষ্যণীয় যে, সৌদি আরবের রাজনৈতিক ভূখণ্ড কখনোই কোন বিদেশী শক্তির উপনিবেশ ছিল না। ফলে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে উপনিবেশিক আমলের যে সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব পড়েছিল সৌদি আরব সব সময়ই তা থেকে মুক্ত ছিল। ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রের পতনের পরেও সৌদি আরবে আলিমদের সাথে ক্ষমতাসীনদের একটি সুন্দর সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা অন্যান্য আরব দেশ থেকে তাদেরকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। দেশটিতে এখন পর্যন্ত কোন লিখিত সংবিধান নেই। আলিমগণ শরীয়ার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন এবং তার ভিত্তিতে নির্বাহী সিদ্ধান্ত, আইন ও বিচার কার্যকর হয়। এই ব্যবস্থা ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সৌদি আলিমগণ মনে করেন, লিখিত সংবিধান প্রণীত হলে আল্লাহর আইনের প্রাধান্য কমে যাবে এবং আলিমদের গুরুত্বও হ্রাস পাবে। এজন্য তারা লিখিত সংবিধানের বিরোধিতা করেন। সৌদি আরবের এই ব্যবস্থা ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও বাদশাহ কখনো নিজেকে মুসলিম বিশ্বের 'খলীফা' হিসেবে ঘোষণা করেননি। বরং সাম্প্রতিককালে বাদশাহ নিজেকে 'পবিত্র মক্কা ও মদীনার খাদেম' (খাদেমুল হারামাইন আশ-শরীফাইন) বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সৌদি নাগরিকদের এটাই ধারণা যে, বাদশাহ শরীয়ার আলোকে 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ' করেন। তিনি নিজে কোন আইন রচনা করতে পারেন না এবং আইন প্রণয়নের জন্য কোন বিশেষ সংস্থাও নেই। আলিমগণ আইনের ব্যাখ্যা করেন এবং বাদশাহ প্রশাসনিক আদেশ জারী করেন, তবে তা শরীয়া আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হয় না। বাদশাহর জারীকৃত ফরমানগুলো সংবিধিবদ্ধ (কডিফাই) করা আছে। তবে শরীয়া আইনের কোন সংবিধিবদ্ধ কোন কাঠামো (কডিফিকেশন) নেই।

সৌদি আরবের আলিমগণ তাদের কার্যক্রমের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীনতা বজায় রাখেন। তেলসমৃদ্ধ দেশটির রাজস্ব তহবিল থেকে তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেলেও তারা সরকারের বেতনভুক্ত কর্মচারী নন এবং সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণও করেন না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা নিয়ে আলিমগণ তাদের জ্ঞানের গভীরতা ও উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ হয়ে সামাজিক মর্যাদা

লাভ করেন। জ্যেষ্ঠ আলিমগণ 'শাইখ' বা 'মুফতী' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সিনিয়র মুফতীরা যোগ্যতা বিবেচনা করে জুনিয়র মুফতীদের ফাতওয়া প্রদানের কর্তৃত্ব (অথরিটি) প্রদান করেন।

সৌদি আরবে গ্রান্ড মুফতীর পদটি সরকারীভাবে স্বীকৃত; তবে এপদে নিয়োগ দেয়ার সময় সরকারকে অবশ্যই প্রার্থীর যোগ্যতা তথা শরীয়া ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞানের গভীরতা ও প্রজ্ঞার বিষয়কে বিবেচনায় রাখতে হয়। গ্রান্ড মুফতী ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য মুফতী; তবে তারা কোন বিষয়ে ফাতওয়া বা মতামত দেবার ব্যাপারে গ্রান্ড মুফতীর অধীন থাকেন না। তারা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করে থাকেন। দেশটিতে মুফতীদের মধ্য থেকেই বিচারক নিয়োগ করা হয়।

সাংবিধানিক বিবেচনায় সৌদি আলিম সমাজ হচ্ছেন শরীয়া ও আইনের রক্ষক এবং শাসকদের বৈধতা প্রদানের কর্তৃত্বের অধিকারী (অথরিটি)। রাষ্ট্র বা সরকার কোন নীতিগত বিষয়ে মুফতীদের ফাতওয়া বা মতামত গ্রহণ না করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯৯১ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে সৌদি ভূখণ্ডে মার্কিন সৈন্য মোতায়েনের বিষয়ে গ্রান্ড মুফতী শেখ আবদুল্লাহ বিন বায-এর ফাতওয়া গ্রহণ করেই সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। বস্তুত: রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সম্পর্কিত সকল বিষয়েই মুফতীদের মতামত নিয়ে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নীতিগত বিষয়েও সরকার মুফতীদের মতামত গ্রহণ করে থাকে। বাদশাহ আবদুল আজিজ ইবনে সউদ তাঁর আমলে দেশে ওয়ারলেস চালু করেন আলিমদের মতামত নিয়েই। সাম্প্রতিককালে সৌদি নারীদের গাড়ি চালানোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টিও আলিমদের ফাতওয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এব্যাপারে সৌদি সরকার বহির্বিশ্বে কিছুটা বিব্রতও হয়েছে।

নোয়াহ্ ফেল্ডম্যানের মতে, সৌদি মুফতীদের অবস্থান ও মর্যাদা ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রের মুফতীদের চেয়ে কিছুটা দুর্বল। তিনি মনে করেন, সৌদি আলিম সমাজ ও রাজপরিবার সম্মিলিতভাবে এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাস্তবে রাজপরিবারের ৬০০-৭০০ প্রিন্স ও প্রিন্সেস কোন না কোন পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী। তাদেরকে যদি একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য মনে করা হয় তাহলে মুফতীরা হচ্ছেন সে দলের বুদ্ধিজীবি শ্রেণী।

মুহাম্মদ ইবনে সউদ বা তাঁর পুত্র আবদুল আজিজ ইবনে সউদ যখন আরব ভূখণ্ডে তাদের কর্তৃত্ব ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালান তখন কিন্তু তেল সম্পদ আবিস্কৃত হয়নি। সুতরাং এটা বলার সুযোগ নেই যে, তেল রাজস্বের স্বার্থে তারা রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে বিংশ শতকে দেশটিতে তেলের বিশাল ভাণ্ডার আবিস্কৃত হলে তা সৌদি রাজতন্ত্রের জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনে। তাদের দ্রুত

অর্থনৈতক প্রবৃদ্ধি ঘটে। জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য যে, আমেরিকায় তেল আবিস্কৃত হলে তার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের হাতে ছিল না; সেটি ছিল রকফেলার কোম্পানীর মালিকানায়। কিন্তু সৌদি আরবে শুরু থেকেই তেল সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের, কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীর নয়। যদিও রাজপরিবারের সদস্যরা মুক্ত হস্তে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকেন; তবে তার বড় অংশ ব্যয় হয় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও সংহতকরণের কাজে। তারা একদিকে বিশাল অবকাঠামো গড়ে তুলেছেন এবং অপরদিকে বহুবিধ প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছেন। সরকারের বাইরে রাজপরিবারের সদস্যরাও অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এতে প্রচুর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। যখন বিশ্ববাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পায় সৌদি নাগরিকরা তখন তার সুবিধা ভোগ করে। আবার তেলের দাম পড়ে গেলে দেশটির অর্থনীততে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। মন্দা দেখা দিলে সরকার নাগরিকদের অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করে যা বিশ্বের অন্য কোন দেশে দেখা যায় না।

মুফতী ও আলিমগণের মধ্যে যারা সরকারী কোন পদে রয়েছেন তারা সরকারী বেতন-ভাতা পান। অপরদিকে যারা বিশ্ববিদ্যালয় বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত তারা সেখানে সরকারী অনুদান থেকে বেতন-ভাতা পান। নোয়াহ ফেল্ডম্যানের মতে, যারা সরকারী অভিপ্রায়ের বাইরে বড় ধরনের কোন ব্যত্যয় ঘটান তাদেরকে পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয় এবং এমনকি অন্তরীণও করা হয়। কোন কোন পর্যবেক্ষক মনে করেন, সরকারী প্রভাবের কারণে কখনো কখনো মুফতীরা স্বাধীনভাবে মতামত দিতে পারেন না। আবার কেউ কেউ মনে করেন, মুফতীদের স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব খর্ব করা সরকারের পক্ষে চাইলেও সম্ভব নয়। কারণ সৌদি রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে মুফতীদের অবস্থান এতটাই সুসংহত যে, তাদের স্বাধীনতা সহজে খর্ব করা সম্ভব নয়। এছাড়া রাজশক্তির ক্ষমতার বৈধতার জন্য মুফতীদের মতামত ঐতিহাসিকভাবে এতটাই অপরিহার্য যে, তাকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ নয়।

ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রে মুফতী ও শাসক শ্রেণীর দ্বিবিধ সম্পর্কের বিষয় ছিল। নাগরিকদের উপর কর আরোপের ক্ষমতা ও নানাবিধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য শাসক শ্রেণীর বৈধতার প্রয়োজন হতো। আর মুফতীরা সে বৈধতা দিতেন। কিন্তু সৌদি রাজতন্ত্রে মুফতী, শাসক ও নাগরিকদের ত্রিপক্ষীয় সম্পর্কে বিশেষ কোন জটিলতা নেই। তেলসমৃদ্ধ দেশটির নাগরিকদের উপর কর আরোপের বিষয়টি সরকারের জন্য অত্যন্ত গৌণ। কারণ সরকার জনগণের কাছ থেকে কর আদায় করে না, বরং রাজস্ব আদায়ের প্রধান উৎস হচ্ছে রাষ্ট্রীয় তেলসম্পদ। ফলে জনগণের পকেটের প্রতি সরকারকে তাকাতে হয় না। জনগণও সরকারে কে থাকলো আর কে থাকলো না এনিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না। বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে, তেল রাজস্ব থেকে সাধারণ নাগরিকরা উপকৃত হচ্ছে এবং তাদেরকে কোন কর দিতে হচ্ছে না।

মুফতীরা রাজতন্ত্রের বৈধতা দিয়ে সহায়তা করছেন। তাই সাধারণভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাজতন্ত্রের প্রতি জনগণের ক্ষোভ সৃষ্টির কোন উপাদান তেমন একটা নেই।

উপরের আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রে মুফতীদের চাইতে সৌদি আরবের মুফতীরা একটু দুর্বল অবস্থানে রয়েছেন। তবে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় তারা অনেক ভালো অবস্থানে রয়েছেন। তারা মোটামুটি স্বাধীনতা ভোগ করলেও রাষ্ট্র তাদেরকে অনেক সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। মূলত: ঐতিহাসিকভাবে রাষ্ট্র ও শাসকদের বৈধতাদানের ক্ষেত্রে তাদের অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। আর এ জন্যই তাদেরকে রাষ্ট্র-কাঠামো থেকে দূরে সরানো সহজ নয়।

শেষ ভরসা ইসলামী শরীয়া

ইরান ও আফগানিস্তানে আলিমগণের সরকারে নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকলেও একটি ইতিবাচক লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, স্থানীয় পর্যায়ের বিচারব্যবস্থায় শরীয়া আইন কার্যকর করা। যেখানে থমাস হবসের কল্পিত 'আধা-নৈরাজ্যকর' অবস্থা বিরাজমান বা যেখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কোন কার্যকর প্রতিষ্ঠান নেই সেখানে স্থানীয় জনগণ নিজেরাই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শরীয়া আদালতকে মেনে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সোমালিয়ায় গৃহযুদ্ধের সময় এরূপ পরিস্থিতিতে শরীয়া আদালত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে এরূপ শরীয়া আদালত প্রতিষ্ঠিত হলে তার সফলতা দেখে ক্রমান্বয়ে তা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা একটা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। শরীয়া আদালত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার হতে থাকলে যুক্তরাষ্ট্র তার মধ্যে 'ইসলামী সন্ত্রাসবাদ'-এর আশংকা করে ইথিওপিয়ার সহায়তায় সামরিক অভিযান চালায় এবং প্রবাসে থাকা নেতাকে সোমালিয়ায় ফিরিয়ে এনে সরকার প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু সে সরকারও আইন-শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে পারেনি; উপজাতি গোষ্ঠিগুলো শরীয়া আদালতের কাজ অব্যাহত রাখে। কারণ সোমালীয় সমাজে শরীয়া আইন ব্যতীত অন্য কোন আইন দ্বারা সমাজে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা সহজ ছিল না। সোমালিয়ায় শরীয়া আদালতের সফলতার পেছনে তিনটি কারণ ছিল- প্রথমত: দেশটির জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান। দ্বিতীয়ত: দেশটির আলিমগণ সমাজের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত এবং তাদেরকে লোকেরা মান্য করে। তৃতীয়ত: ইসলামের বিশ্বজনীন আবেদন সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহিত করে; এর ফলে সোমালিয়ার বিভিন্ন উপজাতি ঐক্যের একটি সূত্রকে প্রাধান্য দেয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের ভবিষ্যত

আলিমগণের শাসিত ইসলামী রাষ্ট্রের নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও জনগণ ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত হয়নি। একবিংশ শতকের শুরুতে বিভিন্ন মুসলিম দেশে

ইসলামী দলগুলোর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা বেশ লক্ষ্যণীয়। ১৯৯০ সালে আলজিরিয়ার নির্বাচনে ইসলামী দলগুলোর বিজয় দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছে এবং আজো তা অব্যাহত রয়েছে। আরব দেশগুলোতে নির্বাচন সহজসাধ্য ছিল না, তা সত্ত্বেও যেখানেই নির্বাচন হয়েছে জনগণ ইসলামী দলকে বেছে নিয়েছে। ইরাকের নির্বাচনে শিয়া ইসলামপন্থীরা নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে এবং অপরদিকে সুন্নী এলাকাতেও ইসলামী দল বিজয়ী হয়েছে। লেবাননে হিজবুল্লাহ একের পর এক জয়লাভ করে চলেছে। ২০০৬ সালে প্যালেস্টাইনে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে আল-ফাতাহ-কে হারিয়ে জয়লাভ করে হামাস এবং সরকার গঠন করে। মিসর, কুয়েত, মরক্কো, জর্ডান, বাহরাইন, ও সৌদি আরবে সীমিত আকারে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে ইসলামী দলগুলো ভালো করেছে। কারো কারো মতে সেক্যুলার সরকারগুলোর স্বৈরতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড এবং সেবা প্রদানের ব্যর্থতার জন্য জনগণ প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইসলামী দলগুলোকে ভোট দিচ্ছে। তবে এটাও লক্ষ্যণীয় যে, ইসলামী দলগুলো দরিদ্র মানুষের জন্য প্রচুর সমাজকল্যাণমূলক কাজ করে থাকে। এমনকি জনগণের মধ্যে এরূপ ধারণাও রয়েছে যে, ইসলামী দলগুলো ক্ষমতায় থাকুক বা না থাকুক তারা দরিদ্র মানুষের জন্য কাজ করে। কোন কোন দল ইসলামের নামাবলি ব্যবহার করে জঙ্গী পন্থা অবলম্বন করছে। তবে মূলধারার ইসলামী দলগুলো নির্বাচনকেই তাদের নীতি হিসেবে অনুসরণ করছে। আরব দেশগুলোতে কোন নির্বাচনই ইসলামী দলগুলো ছাড়া কল্পনা করা যায় না। এমনকি নির্বাচনের পরিবেশ না থাকলেও তারা একই নীতি অনুসরণ করবে। জর্ডানে মুসলিম ব্রাদারহুডের রাজনৈতিক শাখা ইসলামিক এ্যাকসন ফ্রন্টকে বাদ দিয়ে সেদেশের রাজনীতির আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মরক্কোতে সরকার অনুমোদিত জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে সে দেশের রাজনীতি বুঝা যাবে না। আরব বিশ্বের বাইরেও একই অবস্থা। তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী রেসেপ তাইয়েপ এরদোগানের এ কে পার্টি উদার ইসলামী দল বার বার নির্বাচনে জয়লাভ করছে। সেদেশের সেক্যুলার সামরিক বাহিনী ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ার উপর কড়া নজর রাখছে। তবে একে পার্টি শরীয়া আইন চালুর ব্যাপারটিকে প্রাধান্য দিচ্ছে না। পাকিস্তান সাংবিধানিকভাবেই একটি 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' এবং সেখানে ইসলামী আইনের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক প্রবণতা আমরা কি বুঝতে পারছি? ইসলামী আন্দোলনের গতি কোন দিকে যাচ্ছে? ইসলামী দলগুলোর সফলতা কি বেশি সংখ্যক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকেত দিচ্ছে? এর মাধ্যমে কী গণতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক শরীয়া ভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে? একটা সম্ভাবনা হচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলো সীমিত আকারে হলেও ইসলামী নীতিকে গ্রহণ করে নেবে এবং যুক্তরাষ্ট্র উদার ইসলামী দলের ক্ষমতায় আরোহণের চেয়ে হয়তো এটাকেই পছন্দ করবে।

দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন মুসলিম দেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন জোরদার হচ্ছে এবং এতে ইসলামী দলগুলো বেশ সক্রিয় থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, তারা সাংবিধানিক সংস্কার ও গণতন্ত্রায়নে ইসলামী আদর্শকে সামনে নিয়ে আসতে চাইবে। তারা ক্রমবর্ধমান হারে সরকারে অংশগ্রহণ করবে এবং নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইসলামী আইনকে কার্যকর করতে প্রয়াসী হবে। আফগানিস্তান, প্যালেস্টাইন ও ইরাকের মত দেশগুলোতে সাংবিধানিক পরিবর্তন সত্ত্বেও হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও বিশৃংখলা চলতে থাকবে যাতে সরকার ঠিকমত ইসলামী নীতি অনুযায়ী কাজ করতে না পারে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, চরমপন্থা চলতে থাকলে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার তা ব্যাহত হবে। যেমন ইরাক একদিকে মার্কিন সৈন্যদের উপস্থিতি, অপরদিকে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও বিশৃংখলার কারণে প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে মনোযোগ দিতে পারছে না।

যে সকল মুসলিম দেশে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পরিবেশ রয়েছে সেখানে ইসলামী আইন চালু হয়ে যাবার ব্যাপারে মার্কিনীদের ভয় রয়েছে। এজন্য তারা ঐসব দেশে বহি:হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ইসলামী শক্তিকে কাবু করতে চায়। এরূপ প্রথম ঘটেছে আলজেরিয়ায় যেখানে ইসলামী দলগুলো নির্বাচনে জয়লাভ করলে যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স সামরিক বাহিনীকে উস্কে দিয়ে তাদের ক্ষমতায় যাবার পথ রুদ্ধ করে দেয়। এরপরে একই ধরনের ঘটনা ঘটলো প্যালেস্টাইনে যেখানে হামাস জয়লাভ করলে যুক্তরাষ্ট্র আলফাতাহকে উস্কে দেয়, যাতে হামাসকে ক্ষমতার অংশীদার করা না হয়। কিন্তু জনগণ ম্যান্ডেট দিয়েছিল হামাসকে। ফলে গাজা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

এখন পর্যন্ত কোথাও ইসলামপন্থীদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা গ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। তারা ক্ষমতায় যেয়ে সরকার পরিচালনায় তাদের যোগ্যতা জনগণকে দেখানোর সুযোগ পায়নি। এজন্য জনগণ যে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এমনটিও নয়; কারণ জনগণ দেখছে যে, তাদেরকে কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না। বস্তুত: তারা যদি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায় তাহলে জনগণ হয়তো তাদেরকেই বার বার ভোট দেবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন এসে যায় যে, ইসলামপন্থীদের ক্ষমতায় বসানো হলে তারা প্রকৃতপক্ষে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে কিনা? ইরানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি সরকার ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হলেও তারা সেক্যুলার স্বৈরশাসকদের মতই সাংবিধানিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত (Corrupt) এবং সে কারণে তারা জনপ্রিয় নয়। তারা যদি রাজনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে না পারে তাহলে তাদের অবস্থাও স্বৈরশাসকদের মতই হবে। আর যদি তারা রাজনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে সেক্ষেত্রে আরব ও

মুসলিম বিশ্বে তাদের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে যাবে। ইসলামপন্থীরা এটা করতে সক্ষম হবে কিনা তা নির্ভর করবে তারা কতটা সাফল্যের সাথে শরীয়া বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে তার উপর। এটি ইসলামী আইনসভা হোক বা পার্লামেন্ট হোক তা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অথবা জুডিশিয়াল রিভিউর ব্যবস্থাসহ একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থার উপর তাদের সাফল্যে নির্ভর করবে।

আসলে যে কোন দেশেই নির্বাহী বিভাগের হাতে যখন প্রচুর ক্ষমতা থাকে তখন তাকে আইনের শাসনের আওতায় নিয়ে আসা সারা বিশ্বেই সাংবিধানিক ব্যবস্থায় রহস্যজনক এটি বিষয়। এজন্য কোন কোন জায়গায় পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব দরকার। কোন দেশের দুর্বল শাসকরা হয়তো তাদের বৈধতার জন্য আইনের শাসনের আওতায় আসতে সম্মত হবে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম দেশেই বিপ্লবের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। ইরানের ইসলামী বিপ্লব পরবর্তী সাংবিধানিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য বিধান করা হয়নি। ইরাকে চালাবী ও পল উলফউইটজ-এর সংস্কার সাংবিধানিক ব্যবস্থার পরিবর্তে নৈরাজ্য ও বিশৃংখলার জন্ম দিয়েছে। এর বিপরীতে ক্রমান্বয়ে সংস্কারের কাজটি ইসলামপন্থীদের জন্য অধিকতর উপযুক্ত বলে মনে হয়। এর মাধ্যমে তারা ক্রমান্বয়ে ইসলামকে আইনগত কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। এর সাথে জুডিশিয়াল রিভিউর ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। সম্প্রতি পাকিস্তানে বিচারকরা শক্ত ভূমিকা নিয়েছেন যেখানে তারা শুধু চাকরি না করে ভারসাম্য বিধানকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। তারা রাষ্ট্রীয় শাসন দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হচ্ছেন।

যে কোন সমাজে শূণ্যস্থানে আইন কার্যকর করা যায় না; এজন্য প্রয়োজন হয় মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং আইনের প্রতি মানুষের আস্থা ও অনুশীলন। ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রে এরূপ পরিবেশ ছিল। হয়তো এটা পুরোপুরি ফিরিয়ে আনা যাবে না, তবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে বিচারকদের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার নিয়মাবলি

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দুই কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় কিবোর্ড ব্যবহার করে (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2000) টাইপ / ফন্ট Sutonny MJ ব্যবহার করতে হবে। কাগজের সাইজ A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে : উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১.৬৫ ইঞ্চি, বামে ১.৬ ইঞ্চি। প্রবন্ধের সফ্‌ট কপি সংস্থার ই-মেইল ঠিকানায় পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে লেখকের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রবন্ধের সাথে লেখককে/দের এ মর্মে একটি প্রত্যায়নপত্র জমা দিতে হবে-

ক. জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/ তাঁরা;

খ. প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো জার্নালে মুদ্রিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য তা অন্য কোনো জার্নালে জমা দেয়া হয়নি। উল্লেখ্য যে, প্রত্যায়নপত্র ছাড়া কোনো প্রবন্ধ গৃহীত হবে না।

গ. প্রবন্ধে প্রকাশিত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক/গবেষক জার্নালের ২ (দুই) টি কপি এবং ৫ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. প্রবন্ধ বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণে (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান) রচিত হবে। তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। লেখক কোন বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। তথ্যনির্দেশের ক্ষেত্রে শব্দের উপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন[১]) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থ ও জার্নাল থেকে তথ্যসূত্র নিম্নোক্ত ভাবে লিখতে হবে।

যেমন– গ্রন্থ :

ক. কাজী এবাদুল হক, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ.২৯

খ. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ইসমু মানিইয যাকাত, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১১০

গ. যিকরা তাহা হুসাইন, *জামহুরিয়াতু মিসর আল-আরাবিয়্যাহ*, ওযারাতুস সাকাফা, আল-কাহেরা : আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৭৭, পৃ. ১০৩

প্রবন্ধ ঃ

* Dr. Taslima Monsoor, *Dissolution of Marriages on Test A Study of Islamic Family Law and Women, Journal of the Faculty of Law,* University of Dhaka, Volume:15, Number:1, June 2004, p. 26

৬. মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। *গ্রন্থ ও পত্রিকার নাম বাঁকা অক্ষরে (Italic) হবে যেমন,* গ্রন্থ ঃ *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন;* পত্রিকা : *Journal of Islamic law and judiciary.*

৭. আল-কুরআনুল করীম ও হাদীসসমূহের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত অনুবাদ অনুসরণ করে চলতি রীতিতে রূপান্তর করতে হবে, তবে রেফারেন্সদানের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের (আরবি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজি যে ভাষায় হোক তা অপরিবর্তিত রেখে) টেক্সট দিতে হবে। Secondary source এর উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য নয়। আল-কুরআনুল করীম ও হাদীসের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে। **কুরআনের উদ্ধৃতি হবে এভাবে–** আল-কুরআন, ২:১৫। **হাদীসের উদ্ধৃতি হবে এভাবে–** ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় (ابواب/كتاب): , অনুচ্ছেদ (باب):........, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান:---, প্রকাশকাল---, খ.--, পৃ.--। ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ দিতে হবে।

৮. প্রকাশিত প্রবন্ধের ব্যাপারে কারো ভিন্ন মত থাকলে যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

৯. প্রবন্ধের শুরুতে 'সারসংক্ষেপ' এবং শেষে 'উপসংহার' অবশ্যই দিতে হবে।

১০. কুরআন ও হাদীসের আরবী Text প্রতি পৃষ্ঠার নিচে ফুটনোটে এবং অনুবাদ মূল লেখার সাথে দিতে হবে।

প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকানা
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন :০২-৭১৬০৫২৭, ০১৭১৭-২২০৪৯৮, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
ই-মেইল: islamiclaw_bd@yahoo.com. www.ilrcbd.org

REG. NO. DA -6100, ISLAMI AIN O BICHAR : OCTOBER-DECEMBER : 2012